বিশ্বায়ন এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ঃ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাসন সংক্রান্ত শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

তত্ত্বাবধায়ক ঃ

ড. সাব্বীর আহমেদ

সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

এম.ফিল. গবেষক ঃ

নিবেদিতা রায়

রেজিঃ নং- ১৫৩

সেশন ঃ ২০০৯-২০১০

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপনের তারিখ ঃ ডিসেম্বর ২০১৬

বিশ্বায়ন এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ঃ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাসন সংক্রান্ত শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

তত্ত্বাবধায়ক ঃ
ড. সাব্বীর আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

এম.ফিল. গবেষক ঃ
নিবেদিতা রায়
রেজিঃ নং- ১৫৩
সেশন ঃ ২০০৯-২০১০
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপনের তারিখ ঃ ডিসেম্বর ২০১৬

উৎসর্গ

বাবা ও মাকে

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বিশ্বায়ন এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ঃ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাসন সংক্রান্ত শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করি নাই।

নিবেদিতা রায়
এম.ফিল. গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম ফিল ডিগ্রীর জন্য নিবেদিতা রায় লিখিত **"বিশ্বায়ন এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ঃ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাসন সংক্রান্ত শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তার লিখিত একটি গবেষণা। লেখকের বর্ণনামতে এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেন নাই।

(ড. সাব্বীর আহমেদ)
তত্ত্বাবধায়ক ও সহযোগী অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণার জন্য যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। গবেষণার শিরোনাম অনুমোদনসহ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও অধ্যায়গুলোর অনুক্রমিক বিন্যাসের প্রতিটি ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে এ গবেষণাটি সম্পাদনের সহযোগিতার জন্য আমি আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় ড. সাব্বীর আহমদ এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণা কাজের জন্য আমি বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের গ্রন্থাগার এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সংরক্ষিত রেকর্ডসমূহের সাহায্য নিয়েছি। এসকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। শিক্ষাবিদ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উর্দ্ধতন বিশেষজ্ঞরাও আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া আমার পরিবারের অন্যতম সদস্যরা, বাবা রবীন্দ্র নাথ সরকার, মা নিয়তী রানী সরকার সবসময় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। আমার স্বামী হিরন্ময় কর্মকার নানা ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে এবং গবেষণা কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে একমাত্র পুত্র কাব্যতীর্থকে যথাযথ সময় দিতে পারিনি। এদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

তাং-

নিবেদিতা রায়

সারমর্ম

বিশ্বায়নের ছত্রছায়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ একত্রিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা এক্ষেত্রে বিশ্বায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। ক্ষুদ্র জাতিরাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পরামর্শ মেনে নিয়ে নিজ রাষ্ট্রে সংস্কার সাধন করছে। জাতিরাষ্ট্রের উপর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বায়নের প্রভাব নিয়ে তিন ধরনের বিতর্ক রয়েছে। যথা, অতি বিশ্বায়নপন্থী, সংশয়বাদী ও রূপান্তরবাদী। এই তিন ধরনের তাত্ত্বিকদের যুক্তির আলোকে এই গবেষণায় বাংলাদেশের 'প্রাথমিক শিক্ষাখাতে' বিশ্বায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বিশ্বায়নের যাত্রা শুরু হয় দারিদ্র্য বিমোচনকে কেন্দ্র করে। ১৯৮০-এর দশকে সুশাসন সংক্রান্ত ইস্যুতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ অগ্রাধিকার লক্ষ্য করা যায়। এ সময় থেকেই আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে দাতা সংস্থাগুলো তাদের পরামর্শ প্রদান শুরু করে। মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃত বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে '৯০-এর দশক থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগি সরকারকে সহায়তা করে আসছে। জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম প্রকল্প হিসেবে চালু রয়েছে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার পরেও সকল শ্রেণির শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন পরিবর্তন করা হলেও শিক্ষার গুণগত মান ও দক্ষতায় ঘাটতি দেখা যায়। এই গবেষণায় রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার অন্যতম অংশ 'প্রাথমিক শিক্ষা'র উন্নয়নের সিদ্ধান্ত কীভাবে আর্থিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিশ্বায়ন কেন্দ্রিক উপরোক্ত তিন ধরনের বিতর্কের আলোকে সেটি বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাটি মূলত গুণগত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে সাক্ষাৎকার ও মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রভৃতির সংরক্ষিত রেকর্ডসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্বায়নের রূপান্তরবাদী তাত্ত্বিকরা মনে করেন সুশাসনের ব্যতয় ঘটেছে এই অভিযোগে বহুপাক্ষিক দাতারা নিজেদের শাসন সংক্রান্ত নির্দেশনা ও সাহায্য নিয়ে জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর শক্তিশালী অবস্থান, স্বনির্ভরতা ও দক্ষতার মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয়সাধন নিজেদের সক্ষমতার পরিবর্তন করতে সহায়ক ভূমিকা রাখাতে পারে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাখাত এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সারণি তালিকা

সারণি	১	ঃ	বাংলাদেশের শিক্ষার প্রকৃত ভর্তির হার (NER) ১৯৯৭-২০০৫
সারণি	২	ঃ	বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা : সামগ্রিক ভর্তি, ভর্তি হার (GERs) ১৯৯৭-২০০৫
সারণি	৩	ঃ	প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় মূল ধারার বিদ্যালয়সমূহের ফলাফল
সারণি	৪	ঃ	দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির কৃতি সূচকসমূহ (২০০৫-২০০৯)
সারণি	৫	ঃ	স্থূল ও প্রকৃত ভর্তির হার (Gross and Enrolment Rates)
সারণি	৬	ঃ	অভ্যন্তরীণ দক্ষতা সূচক হার (২০০৫-২০১২)
সারণি	৭	ঃ	২০০৮ সালের জাতীয়ভাবে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন জরিপের ফলাফল, বাংলা এবং গণিত
সারণি	৮	ঃ	নির্দিষ্ট শিখনফলের মাস্টারিং, ২০০৬ এবং ২০০৮ সালের NSA

চিত্র তালিকা

চিত্র	১	ঃ	বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা: প্রকৃত ভর্তির হার ১৯৯৭-২০০৫
চিত্র	২	ঃ	প্রমোশন, পুনরাবৃত্তি এবং ঝরে পড়া (Promotion, Repetition and Dropout)

সূচীপত্র

বিশ্বায়ন এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ঃ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাসন সংক্রান্ত শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

			পৃষ্ঠা নং
ঘোষণাপত্র	ঃ	.....	iii
প্রত্যয়নপত্র	ঃ	.....	iv
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ঃ	.....	v
সারমর্ম	ঃ	.....	vi
সারণি তালিকা	ঃ	.....	vii
চিত্র তালিকা	ঃ	.....	vii
প্রথম অধ্যায়	ঃ	**ভূমিকা .....**	**০১-২৫**
		১.১ প্রাথমিক শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক সংস্থা.....	০২-০৫
		১.২ শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি.....	০৫-০৮
		১.৩ বিশ্বায়ন ও জাতিরাষ্ট্র : বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা.....	০৮-১৬
		১.৪ গবেষণা সমস্যার বিবরণ.....	১৬-২১
		১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য.....	২১
		১.৬ গবেষণার প্রশ্ন.....	২১
		১.৭ গবেষণার যৌক্তিকতা.....	২১
		১.৮ গবেষণার অনুকল্প.....	২২
		১.৯ গবেষণার পরিধি.....	২২
		১.১০ গবেষণা পদ্ধতি.....	২২-২৩
		১.১১ অধ্যায়সমূহের বিবরণ.....	২৪-২৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	**নব্য উদারতাবাদ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং শিক্ষাখাত ঃ একটি তাত্ত্বিক কাঠামো.....**	**২৬-৪৮**
		ভূমিকা.....	২৬
		২.১ নব্য উদারতাবাদ.....	২৬-২৯
		২.২ বিশ্বায়ন ও জাতিরাষ্ট্র : আন্ত:সম্পর্কের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ.....	২৯-৩৫
		২.৩ সার্বভৌমত্ব.....	৩৫-৩৭
		২.৩.১ সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি.....	৩৭

			পৃষ্ঠা নং
		২.৪ রাষ্ট্রের ধারণা.....	৩৭-৩৯
		২.৫ রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্ব	৩৯-৪১
		২.৬ বাংলাদেশের শিক্ষাখাত.....	৪১-৪৩
		২.৭ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান.....	৪৩-৪৪
		২.৮ নয়া উদারবাদী নীতি ও প্রাথমিক শিক্ষাখাত.....	৪৪
		২.৮.১ শিক্ষার পণ্যায়ন.....	৪৫
		২.৮.২ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার.....	৪৫-৪৬
		২.৮.৩ দারিদ্র্য বিমোচনে পরনির্ভরশীলতা তৈরি.....	৪৭
		২.৮.৪ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ.....	৪৭-৪৮
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	**বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ঃ বর্তমান অবস্থার একটি বিশ্লেষণ.....**	**৪৯-৮৪**
		ভূমিকা.....	৪৯
		৩.১ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ও ধারাবাহিক উন্নয়ন.....	৪৯-৫২
		৩.২ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-১ (১৯৯৬-২০০৩).....	৫২-৫৫
		৩.২.১ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণ.....	৫৬-৫৯
		৩.২.২ দক্ষতা.....	৫৯-৬০
		৩.২.৩ শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়.....	৬০-৬১
		৩.৩ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ (২০০৩-২০০৯).....	৬১-৬৬
		৩.৩.১ অংশগ্রহণ.....	৬৭-৬৮
		৩.৩.২ দক্ষতা.....	৬৯-৭৩
		৩.৩.৩ শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়.....	৭৩-৭৫
		৩.৪ মূল্যায়ন.....	৭৫-৮৪
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	**বিশ্বায়ন ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ঃ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার উপর একটি বিশ্লেষণ .....**	**৮৫-৯২**
		৪.১ শিক্ষার অবকাঠামোগত মানোন্নয়ন.....	৮৫-৮৬
		৪.২ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করা	৮৬-৮৮
		৪.৩ দারিদ্র্য বিমোচনে পরনির্ভরতা তৈরি.....	৮৮-৯০
		৪.৪ স্থানীয় জ্ঞানের বাস্তবতাকে গুরুত্ব না দেওয়া	৯০-৯২

			পৃষ্ঠা নং
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	**উপসংহার.....**	**৯৩-৯৮**
		সুপারিশসমূহ.....	৯৩-৯৬
তথ্যসূত্রসমূহ	ঃ	.....	৯৯-১০২
পরিশিষ্ট	ঃ	পরিশিষ্ট ১ ঃ গবেষণায় ব্যবহৃত নমুনার হিসাব.....	১০৩
		পরিশিষ্ট ২ ঃ গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষাৎকারসমূহের বিবরণ.....	১০৪-১০৭

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক বহুল আলোচিত বিষয় 'বিশ্বায়ন'। বিশ্বায়নের বিস্তার বিশ্বের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ওপর প্রভাব ফেলেছে। রাষ্ট্রের চুড়ান্ত, সর্বোচ্চ ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা সার্বভৌমত্ব। এই ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেকোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত। আবার, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বা প্রক্রিয়াগুলোর মধ্য দিয়ে জাতি রাষ্ট্র যখন তার নিজের সুবিধা বড় করে দেখে তখন তা জাতীয় স্বার্থ। এ পর্যায়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থ রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম শক্তির উপর নির্ভর করে। তাই বর্তমানে একটি রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয় আরেকটি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মধ্যে দিয়ে। যোসেফ স্টিগলিৎস (২০০৬) মনে করেন, বিশ্বায়নের আলোকে রাষ্ট্র এখন আধা ধনবান শক্তিশালী রাষ্ট্র ও বিরাট কর্পোরেশনের প্রজেক্ট। বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামোকে 'একক কাঠামো' আকারে হাজির করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে বিশ্বায়ন। ফলে বৈশ্বিক পুঁজির ফলে রাষ্ট্র দিন দিন তার স্বায়ত্তশাসন, ক্ষমতা কিংবা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় রাষ্ট্র তার নিজের শক্তি আর মর্যাদা ধরে রাখতে সক্ষম। অন্য পক্ষটি রিচার্ড ডব্লিউ ফিশারের মতো মনে করেন রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তা আকারে বৈশ্বিক পুঁজিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাতরোধ করতে সক্ষম (ডব্লিউ মিশেল বক্স, ২০০৮)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সাধনের জন্য ব্রেটন উডস্ কনফারেন্সে কয়েকটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা যথা: বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ জাতিরাষ্ট্রগুলোর আন্ত:রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে সুশাসন সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পরামর্শ জাতীয় জীবনে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থাকে সুশাসনে রূপান্তরের জন্য অন্যতম লক্ষ্য ছিল মৌলিক অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা প্রদান। 'শিক্ষা' তেমনি একটি ক্ষেত্র যেখানে সরকার

Dhaka University Institutional Repository

ও সহযোগী দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শে প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতে এ পর্যন্ত ৩টি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এগুলো হলো প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-১ (১৯৯৬-২০০৩), প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-২ (২০০৩-২০০৯) এবং চলমান প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-৩। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-১ কার্যক্রমে চারটি বিভাগে চারটি উন্নয়ন সহযোগী পরীক্ষামূলকভাবে কাজ করে। প্রথম প্রকল্প শেষ হওয়ার পরে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-২ নামে আবারো কার্যক্রম শুরু হয়। এতেও অঞ্চলভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। প্রথম প্রকল্পটি সমন্বিত কর্মসূচি না হলেও দ্বিতীয় প্রকল্পে সমস্যাসমূহের উপযুক্ত সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কার্যকর মডেলের অভাবে পিইডিপি-২ তে টেকনিক্যাল উৎকর্ষতা থাকা সত্ত্বেও এটি শতভাগ সফলতা পায় নাই। এর কারণ হিসেবে অনেকেই মনে করেন এ প্রকল্পগুলো মূলত দাতাগোষ্ঠী প্রদত্ত পরিকল্পনা (আলম ও ভূঁইয়া, ২০০৮)। যেখানে দেশীয় প্রধান অংশীদারদের যথাঃ শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, রাজনীতিবিদ ও সমাজচিন্তাবিদদের অংশগ্রহণ একেবারে নগন্য। বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ধারা ১৫(ক)-তে শিক্ষাকে জীবন ধারনের মৌলিক অধিকার রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৭(ক)-তে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । জাতীয় সংসদে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয় ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সালে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি মৌলিক নীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট রিসার্চ ফোরামের (বিআইডিএস) গবেষণায় দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ঋণ মঞ্জুরি অপরিহার্য। এর কারণ শিক্ষার সুযোগ সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে বিরাট অংকের অর্থ এবং পরিকল্পনা প্রয়োজন। সরকারের একার পক্ষে এ ভার বহন করা কঠিন। শিক্ষার উন্নয়নে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণ ঋণ মঞ্জুরিতে সহায়তা করে। ঋণের পশ্চাতে উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই গবেষণায় বিগত দু'দশকে শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীতে এ ধরনের দুটি কর্যক্রম যথা: পিইডিপি-১ ও পিইডিপি-২ এর বাস্তবায়নের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র শিক্ষা ক্ষেত্রে নিজস্ব সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা দ্বারা কতটুকু প্রভাবিত হয় তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

১.১ প্রাথমিক শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক সংস্থা

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা বলতে ব্যক্তির আচরণের কাঙ্খিত, প্রত্যাশিত ও কল্যাণকর পরিবর্তনকে বোঝায়। শিক্ষা পৃথিবীর সকল দেশেই অতি পরিচিত একটি প্রত্যয়। ইউনেস্কো শিক্ষাকে মানুষের সর্বজনীন গুণাবলী বিকাশ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করেছে। একইভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর শিক্ষার সম্প্রসারণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আহ্বান জানিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা-উত্তর বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো উন্নয়নমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছিল। নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ সংবিধানের নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃত হয়েছে। পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত তিনটি প্রকল্পই সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় গৃহীত হয়েছে। ১৯৯৬-২০০৩ সালের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-১), যা সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প নামে পরিচিত-এর বাস্তবায়নে দাতা সংস্থা আইডিএ, নোরাড, এডিবি, ডিএফআইডি, জাপান সরকার প্রভৃতি কাজ করে। প্রথম প্রকল্পের শেষে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-২) ২০০৩-২০১১ মেয়াদে গৃহীত হয়। সরকারকে সহায়তা করেছে এডিবি, ডিএফআইডি, আইডিএ, ইসি, নোরাড, সিডা, সিআইডিএ, জাইকা, ইউনিসেফ, অস-এইড এবং নেদারল্যান্ড সরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৬ মেয়াদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) বাস্তবায়িত হচ্ছে (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ২০১২)।

এনজিওদের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও সরকারি স্কুল আকর্ষণীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করে তাদের পড়াশোনার মান বৃদ্ধি করাই ছিল পিইডিপি-১ এর অন্যতম লক্ষ্য। পিইডিপি-২ এ শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সমাপনী, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মতো গুণগত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। বর্তমানে অধিক সংখ্যক এনজিও ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে (৫০০-এর বেশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিও) আংশিক বা পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা যায়। আর এ বিদ্যালয় অথবা কেন্দ্রগুলোতে পড়াশুনা করে প্রধানত পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা। এ কেন্দ্রগুলো শুরুতে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত হলেও কোথাও কোথাও তা ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে। ব্যুরো অব নন ফরমাল এডুকেশন-এর ম্যাপিং স্টাডি অনুসারে (BNFE, 2009), ২০০৭ সালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ৫৩,০০০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১.৪ মিলিয়ন শিশু পড়াশোনা

Dhaka University Institutional Repository

করছে। এনজিওদের মধ্যে ব্র্যাক-এর সর্ববৃহৎ উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে। ব্র্যাক প্রায় ৭,৪০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে তাদের কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা দিচ্ছে তাদের সেন্টারের মাধ্যমে অথবা পার্টনার স্থানীয় ছোট ছোট এনজিওর মাধ্যমে। ROSC কর্মসূচির শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্ত রয়েছে। একটি প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০০,০০০ জন কিন্তু বাস্তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭০০,০০০ জন (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ২০১১)। ROSC-এর কেন্দ্রগুলো এনজিওদের দ্বারা পরিচালিত। শহর অঞ্চলের নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে দেখা যায় না। যদিও বিনা বেতনে অধ্যয়ন, যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষক ও শিক্ষণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তথাপি স্বচ্ছল অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের এসব বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহী হন না। অন্যদিকে, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আগ্রহী করতে বেসরকারিভাবে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উৎসাহব্যঞ্জক কার্যক্রম গ্রহণ করে। প্লান বাংলাদেশ, ব্র্যাক প্রভৃতি সংস্থা এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। টিফিন প্রদান, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, বিনোদনমূলক কাজের মাধ্যমে প্রদত্ত শিক্ষা কার্যক্রমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আগ্রহ লক্ষ্যণীয় যেমন, প্লান বাংলাদেশ ২০০১ সালে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য সুরভী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এখানে শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ, দেশপ্রেম, নাগরিকত্ব বোধ, কর্তব্য বোধ, কৌতূহল বোধ, সৃজনশীলতা, অধ্যাবসায়, সদাচার, ন্যায়-নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন করতে সহায়তা করে (আলম ও মল্লিক, ২০০৭)। বেসরকারি সংস্থার এ সমস্ত উদ্যোগ সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা অনুসরণ করেন। নতুন পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সময় এ সকল গুণাবলী প্রান্তিক যোগ্যতার মানদণ্ড অনুযায়ী বিবেচিত হয়েছে।

ডিএফআইডি প্রণীত পরামর্শ ও অর্থায়নে চাকুরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশের আশির দশকে ক্লাস্টার ট্রেনিং-এর যে পরিকল্পনা করে, তার পরবর্তী বর্তমান রূপ সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং। বর্তমানে শিক্ষক প্রশিক্ষণে সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নোরাড, আইডিএ ও জাপান সরকারের সহযোগিতায় নতুন বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও মেরামত, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং থানা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ করা, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ (কাগজ ও ছাপা), বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে স্টেশনারী সামগ্রী সরবরাহ, গ্রাম পর্যায়ে সামাজিক সচলতা সৃষ্টি, পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম পরিপ্রেক্ষিতে সি-ইন-এড শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও পিটিআই ইনস্ট্রারদের প্রশিক্ষণ, সরকারি ও বেসরকারি

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয়ের ৪২০০ শিক্ষণ শিখন সামগ্রী সরবরাহ ও সামাজিক সচলতা সৃষ্টির মতো কাজ পরিচালিত হয়। দারিদ্র্য জনবহুল দেশে সরকারের একার পক্ষে শিক্ষার মতো বিস্তৃত প্রত্যয়কে সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এ কারণে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ দেখা যায়।

আলোচ্য গবেষণায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সামগ্রিক ভর্তি হার, দক্ষতা অর্জন এবং শিক্ষা সম্পৃক্ত অভ্যন্তরীণ সমস্যা এই তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে শুরু হওয়া অগ্রগতি ২০০৪-২০০৫ সালের দিকে এসে থমকে গিয়েছিল। পরবর্তীতে ভর্তি হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫ম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফলাফল দেখা গেলেও দক্ষতার মান নিয়ে জনসমাজে প্রশ্ন রয়েছে। প্রকল্পরূপে বরাদ্দকৃত অর্থ সব শ্রেণীর শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে কি না? শিক্ষকদের বেতন উন্নত জীবন মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কী? রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অথবা দাতাগোষ্ঠীর সমন্বিত উদ্যোগে যথাযথ মনিটরিং-এ ব্যর্থতা আছে কিনা সেগুলো তুলে ধরে গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক শিক্ষাখাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাব বিশ্লেষণের প্রয়াস করেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিক শিশুকে বিদ্যালয়ে অন্তর্ভূক্তি যেমন সফলতা, তেমনি মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান ও বাস্তব জীবনে তার প্রভাব কতটুকু কার্যকর সেটিও বিবেচ্য। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় এ পর্যন্ত গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি মূলত দাতা সংস্থা ও দেশ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প হিসেবে কার্যকর হয়েছে। অর্থ প্রদানকারী এ সমস্ত সংস্থার পরামর্শকরাও দেশীয় পরামর্শকদের সাথে কাজ করে। প্রাপ্ত অর্থের একটি বড় অংশ পরামর্শকদের সম্মানী বাবদ চলে যায়। কিন্তু শিক্ষকদের বেতন কাঠামোর নাজুকতা মেধাবী শিক্ষার্থীদের এ পেশায় আসতে ক্রমাগত অনাগ্রহী করে তোলে। বিদ্যালয়গুলো পরিচালনায় স্থানীয় কমিউনিটির অংশগ্রহণ প্রায়শই রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত। গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা, ভালো ফলাফলের প্রবণতায় কোচিং নির্ভরতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, মনিটরিং-এর অভাব, দাতাগোষ্ঠীর প্রদেয় অর্থছাড়ের উপর নির্ভরতা প্রভৃতি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করে গবেষণায় সেটি আলোচিত হয়েছে।

১.২ শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি

Dhaka University Institutional Repository

একটি উচ্চ ঋণগ্রস্থ দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ঋণসুবিধা পাবার জন্য বাংলাদেশ অন্তবর্তীকালীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি-১) প্রণয়নের কাজ শুরু করে ২০০০ সালে এবং প্রথম খসড়া তৈরি করে ২০০২ সালের এপ্রিলে। পরবর্তীতে উভয় ঋণদাতার পরামর্শ অনুসারে দ্বিতীয় খসড়া তৈরি করে একই বছরের ডিসেম্বরে। উভয় খসড়াতেই দারিদ্র্যের সাথে শিক্ষার মধ্যেকার সম্পর্ককে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। ২০০০ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের দ্বিতীয় সংস্করণে মানব দারিদ্র্যের তিনটি সম্প্রসারিত মাত্রাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো: স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি ক্ষেত্রে বঞ্চনা। জাতিসংঘ সহস্রাব্দ সম্মেলন ২০০০-এ বাংলাদেশ ২০১৫ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি লক্ষ্যের উন্নয়নে অভিষ্ট পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এর মধ্যে ছয় বছর বয়সী শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা অন্যতম। এক্ষেত্রে গরিব পরিবারের শিশুদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। যদিও গরীব ও ধনী পরিবারের শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতির মধ্যে বিরাট বৈষম্য রয়ে গেছে। প্রায় ১২ মার্কিন ডলার সার্বিক স্বাস্থ্যব্যয় (যার এক তৃতীয়াংশ সরকারি ব্যয়) কে পিআরএসপি-১ দারিদ্র্য বিমোচনে নিতান্ত অপ্রতুল মনে করে। শিক্ষা খাতের সফলতার জন্য সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছে। কাঠামোগত কিছু দূর্বলতা রয়ে গেলেও সাক্ষরতার হার, বিদ্যালয়ে ভর্তির শতকরা হার, নারী শিক্ষার অগ্রগতি, ঝড়ে পড়ার হার কমে যাওয়াসহ শিক্ষার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভালো করেছে। বিশ্বব্যাংক, ইউনেস্কো, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামসহ আন্তর্জাতিক দাতা ও গবেষণা সংস্থা বাংলাদেশের শিক্ষার অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছে। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার নতুন সংযোজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুনগত মান বৃদ্ধি করবে বলে তারা আশা করেন। যথাসময়ে পাঠ্যবই বিতরণ শিক্ষার অগ্রগতিতে বড় ভূমিকা রাখছে। দেশব্যাপী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকার ও এনজিও একত্রে কাজ করছে মন্তব্য করে দাতা সংস্থাগুলো বলছে, দেশের জাতীয় শিক্ষার মান উন্নয়নে, গুনগত মান রক্ষায় নির্দেশিকা প্রণয়নে সরকারের কাঠামোর ভেতর থেকেই এনজিওগুলো সরকারকে সাহায্য করে যাচ্ছে। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের এই প্রয়াসগুলোয় সন্তোষ প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ অতিরিক্ত ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে। এ বিনিয়োগ তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-৩) বাস্তবায়নে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার দুটি বিষয়ে সফলতা সরকারকে যেমন উৎসাহী করে, তেমনি কাঠামোগত দূর্বলতাকেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পিআরএসপি-১ স্বীকার করে যে, অসমতার অর্থনীতি, দারিদ্র্যতা শিক্ষা গ্রহণে বৈষম্য তৈরি করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরে আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে অনেক শিশু ঝরে পড়ে। সবচাইতে গরিব, সুবিধাবঞ্চিত ও দু:স্থ জনগণ সরকারি ব্যয়ের সিংহভাগ ভোগ করতে পারলে স্বাস্থ্যখাতের মতো শিক্ষাখাতেও আর্থ-সামাজিক অসমতা দূর হতে পারে বলে পিআরএসপি-১ মনে করে। বিদ্যমান সংকট থেকে উত্তরণ ও মনিটরিংয়ের জন্য সরকারের দক্ষ আমলা প্রয়োজন। বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের মত বিষয়গুলো কোনো একক রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকার হলেও অন্যান্য রাষ্ট্রের সুযোগ ও সমৃদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্যগুলো পিছিয়ে থাকা দেশগুলোকে একটি বৈশ্বিক লক্ষ্যে নির্ধারণ করে দেয়। এ খাতে প্রাপ্ত সাহায্য সরকারের দক্ষ পরিচালনায় পরিচালিত হলে রাষ্ট্রের ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিয়ে নির্দেশাবলী হাজির করে। বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইটে স্থাপিত পিআরএসপি সংক্রান্ত দলিলে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য যে দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে সেখানে শিক্ষাখাতে এনজিও ও দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির কথা বলেছে। এছাড়া আছে সর্বক্ষেত্রে বাজারমুখী আরো সংস্কার কাজ করা। যদিও আশপাশের কয়েকটি দেশের তুলনায় তো বটেই, বিশ্বের বহু প্রান্তের অর্থনীতির তুলনায় বাংলাদেশে উপযুক্ত "সংস্কার" অনেক দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হলেও বারবার সেগুলোকে অধিকতর দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করার জন্য বলা হয়েছে দারিদ্র্য নিরসনের কৌশলপত্রে (মুহাম্মদ, ২০১১)।

বিশ্বায়নকে একক, সংহত বৈশ্বিক বাজার সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। বিশ্বায়নের ইতিহাসে বাণিজ্য, অর্থায়ন ও তথ্যের আন্তর্জাতিক প্রবাহের বিস্তৃতি গভীরতর হওয়ার ঘটনা লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরে নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থনীতি গ্রহণ করলেও '৮০ দশকের শুরুতেই নিজের বাজার উন্মুক্ত করে দেয়। বাজার উদারীকরণের পথে বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় আমদানি ও আন্তর্জাতিক সাহায্য বৃদ্ধি পেলেও দীর্ঘ সময়ে এর তেমন কোনো সুফল দেখা যায় নাই। বাংলাদেশের সংবিধানে চারটি মূলনীতির একটি ছিল সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা যেন ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি না

Dhaka University Institutional Repository

করে, সেটাই ছিল এর অন্যতম কারণ। কিন্তু বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের আন্তর্জাতিক শক্তির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমাগত বেসরকারিকরণের মাধ্যমে সংবিধানের চারটি মূলনীতির একটি 'সমাজতন্ত্রে'র ধারণা থেকে রাষ্ট্র সরে এসেছে। বিশ্বায়নের প্রভাব শিক্ষাখাতেও লক্ষ্যনীয়। যেমন ইংরেজি মাধ্যেমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের ব্যয়ভার অধিক হওয়ায় সকলে তা বহন করতে পারে না। মাদ্রাসা শিক্ষার পদ্ধতিও ভিন্ন। তুলনামুলকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের শিশুরা এ শিক্ষায় বড় হচ্ছে। রয়েছে বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে গ্রেডিং পদ্ধতির ভালো ফলাফল শিক্ষার্থীকে ভালো একটি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে প্রতিযোগীতামুখী করে তোলে। রাজনৈতিকভাবে ভালো ফলাফলকে শাসন কাঠামোর ইতিবাচক দিক মনে করা হলেও শিক্ষার গুণগতমান প্রশ্নবিদ্ধ হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা অপর্যাপ্ত এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহজেই একটি ভালো বিভাগে ভর্তি হবার সুযোগ শিক্ষার মানে সনদ প্রত্যাশিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে। এছাড়াও রয়েছে শিক্ষাঙ্গনে অপ-রাজনীতি। জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক অস্থিরতায় হরতাল, অবরোধের মতো কর্মসূচি। এ সকল কর্মসূচি শিক্ষা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করে। মেধা বিকাশের অপরিমিত সুযোগ নাগরিকের সুচিন্তিত ব্যবহারে জীবন-মানের ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এ সকল কিছুই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিরাট ভূমিকা রাখছে। International Herald Tribune তাদের সাময়িকীতে প্যারিসে অনুষ্ঠিত দাতা দেশগুলোর বৈঠকের ফলাফল প্রকাশ করে। দাতা দেশগুলো সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের কাছে তিনটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যথা: ১) রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ, হরতালের মতো রাজনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার বন্ধ করা এবং আইনের শাসন স্থাপন করা; ২) দুর্নীতি রোধকরণ এবং ৩) সরকারের এমন কোন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যা বিরোধী দলের সহিংস বিরোধিতা বন্ধ করতে পারে (আহমেদ, ২০০৫)। সুশাসনের ব্যত্যয় ঘটেছে এই অভিযোগে উন্নয়ন সহযোগীরা এদেশের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকেন। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূর করতে বিবাদমান পক্ষগুলোকে সমাধানে আহবান জানায়। সুতরাং রাষ্ট্র নিজেও নয়া উদারতাবাদকে সমর্থন করে আবার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রায়শই অসামর্থ্য হয়।

১.৩ বিশ্বায়ন ও জাতিরাষ্ট্র ঃ বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

Manfred B. Steger ও Ravi K. Roy (২০১০) বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে একুশ শতকের পৃথিবীতে নব্য উদারতাবাদের আলোকে মৌলিকভাবে পরিবর্তিত সম্পর্কগুলোর বিস্তৃত ব্যাখা করেছেন। তাঁদের মতে, ক্রমবর্ধমান কৌশলগত ধারায় উদারনীতি সম্বনিত কল্যানমুখী চিন্তা-ভাবনা ও মধ্যপন্থী সামাজিক নীতির একটি নতুনত্ব মিশ্রণের প্রতিনিধিত্ব করে নব্য উদারতাবাদ। লেখকদ্বয় দেখিয়েছেন নব্য উদারতাবাদ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ মূলত বিশ্ববাণিজ্য ও বিশ্বায়নের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য "প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার" পদ্ধতির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এটি দু'টি উদার মতবাদ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকে। এগুলো হলো: ১) উদার আন্তর্জাতিকতাবাদ, ২) অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদ। উদার আন্তর্জাতিকতাবাদ আন্তর্জাতিক নীতির বিভিন্ন উপাদান যেমন, মানবিক সাহায্য, কূটনীতি এবং শুধুমাত্র যখন প্রয়োজন সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আত্মরক্ষা ও মানবাধিকারের মতো উদার মূল্যবোধের বিস্তারের সাথে সংযুক্ত। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উদারনীতি বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নীতিমালার হাত ধরে নব্য উদারতাবাদ ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁরা রোনাল্ড রিগ্যান, মার্গারেট থ্যাচার, বিল ক্লিনটন, টনি ব্লেয়ার, জন হাওয়ার্ড এবং জর্জ ডব্লিও বুশ এর শাসনামলের বিভিন্ন নীতিমালার কথা উল্লেখ করে দেখান যে, প্রত্যেকের মধ্যে নীতিগত মিল রয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতির বিনিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে উন্মুক্ত ও উদার করা এবং একটি একক বিশ্ব বাজার সৃষ্টি করা। এই মতাদর্শের আগ্রহীরা মনে করেন যে, সামাজিক কল্যানের চুক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে কর্পোরেট দায়িত্ববোধ থেকে এবং সর্বোচ্চ পুঁজিবাদের সমন্বয়ে। এই গবেষণায় রাষ্ট্রের সেবাখাতে ও নীতিমালা নির্ধারণে আলোচ্য নব্য উদারতাবাদের আদর্শ যে প্রভাবশালী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মৌলিক বিষয়গুলোতে পরিবর্তন আনে তা বিশ্লেষণের মাধ্যেমে শিক্ষা ক্ষেত্রে নব্য উদারতাবাদের প্রভাবকে চিহ্নিত করতে সক্ষম। নব্য উদারতাবাদীরা একত্রিত বাজার ব্যবস্থা অপরিহার্য মনে করেন । এজন্য পণ্য, সেবা ও মূলধনের বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার প্রতিষ্ঠা করতে হলে সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে বড় বাঁধা মনে করেন। অর্থ্যাৎ বিশ্বব্যাপী প্রয়োগযোগ্য ও বৈশ্বিক চাহিদাসম্পন্ন পণ্যের বাজার বৃদ্ধিতে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এর বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়। তাই আলোচ্য গবেষণার নব্য

Dhaka University Institutional Repository

উদারতাবাদের নির্ধারকগুলো রাজনৈতিক অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন এনেছে তা খুঁজে বেড় করতে সাহায্য করবে।

Philipp Genschel ও Laura Seelkope (২০১৫) প্রতিযোগী রাষ্ট্র গবেষণায় পুঁজিবাদী সচলতার সমাজে রাষ্ট্রের রূপান্তরিত হবার প্রক্রিয়াকে ব্যাখা করেন। সরকারকে সামাজিক চাহিদা অপেক্ষা বাজার মুনাফায় আগ্রহী হতে দেখা যায়। তারা বলেন, এটি এমন একটি রাষ্ট্র কাঠামো, যা ১৯৭০ সাল থেকে পাশ্চাত্য সমাজ ও পুরো বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্ব করছে। সামষ্টিক অর্থনীতি নয় বরং ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে আগ্রহী যেমন, শিক্ষা এবং গবেষণা অপেক্ষা জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি এবং জনকল্যাণের নামে রাজনীতিতে সর্বাধিক মনোযোগ দেয়। তারা যুক্তি দেখান যে, ওই সিডিভূক্ত দেশগুলোসহ পুরো পৃথিবীর অনান্য দেশগুলোতে সামষ্টিক-সামাজিক রাজনৈতিক ধারা একইভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। রাজনৈতিক অর্থনীতিতে আধুনিক বিশ্বের নব্য উদারতাবাদ বিভিন্ন পরিবর্তন সাধন করে। ফলাফলস্বরূপ কল্যাণমূলক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকারের কাজের দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পায়। সামাজিক সম্পর্কগুলো ব্যাপক মাত্রায় বাজারজাতকরণ এবং প্রতিযোগিতায় স্বতন্ত্র সত্তার জন্য রাষ্ট্রগুলোর রূপান্তর ঘটে। নব্য উদারতাবাদের শর্তগুলো তুলনামূলক রাজনৈতিক অর্থনীতির মূল ধারায় পরিবর্তন আনে যেমন, পুঁজিবাদের সমর্থন, বিশ্বায়নের বিরোধী পক্ষের বিরোধীতা, গুনগত মানের জন্য প্রতিযোগীতার মনোভাব তৈরি। লেখকদ্বয় বলেন, পুঁজির আন্ত:প্রবাহ শ্রমিককে তার চাহিদা ও বেতন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এভাবে বেকারত্ব কমে আয় বৃদ্ধি পায়। অধিক উৎপাদন অর্থনৈতিক সূচকে অধিক পারিশ্রমিক অথবা শ্রমমূল্য প্রদান করে। অন্যদিকে আয়ের বৃদ্ধি অধিক ভোগের সৃষ্টি করে। ভোগের আয়তন বাড়লে মুনাফার আয়তনও বাড়ে। যা পরবর্তী সময়ে উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। শক্তিশালী প্রযুক্তি এই অধিক উৎপাদনকে সহায়তা করে। উন্মুক্ত অর্থনীতিতে সেবাখাতের আয়তন বড়। সুতরাং যদি বড় দেশে সেবাখাতের উপর বেশি কর আরোপ করা হয় তবে, বিনিয়োগ করতে আসা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিক অর্থ ব্যয় করতে হয়। গবেষণাটি দেখায় প্রতিযোগীতার মনোভাব কীভাবে রাষ্ট্রগুলোর কল্যাণমূলক কাজের অবক্ষয় করে। সাধারনত পুঁজির সচলতার জন্য রাষ্ট্র ব্যয় কমানোর জন্য কল্যাণমূলক কাজের খরচ কমাতে বাধ্য

Dhaka University Institutional Repository

হয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য করের হার বাড়িয়ে দেয়, বেসরকারি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উৎপাদনের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। বিশেষায়িত উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে অর্থনীতিকে আরো সংহত করতে উৎসাহি হয়। সমকেন্দ্রিকতার দিকে ধাবিত হতে প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার সাধনে নব্য উদারতাবাদের আদর্শ গ্রহণ করে। তবে, সমসাময়িক অর্থনৈতিক আধিপত্য অভূতপূর্ব কোন ঘটনা নয়। অর্থনৈতিক গতিধারায় অভ্যন্তরীণ বাজারে এই অনুপ্রবেশ পূর্ব নির্ধারিত। গবেষণাটিতে রাষ্ট্র কীভাবে বহি:স্থ চাপকে মোকাবেলা করবে এবং এই চাপ কীভাবে প্রতিযোগীতা বৃদ্ধি করে সেই ব্যাখ্যা দেন নাই। দেখা যায় ওই সিডিভূক্ত দেশগুলো নব্য উদারতাবাদের কৌশলগুলো গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা, নাগরিক সন্তুষ্টি অধিক মাত্রায় নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে চিলি, সিংগাপুর, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া অথবা নব্য উদারতার আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করেনি, সে সমস্ত দেশ অপেক্ষা ওই সিডিভূক্ত দেশগুলো প্রথম সারিতে অবস্থান করে।

McGiffen (২০০২) বিশ্বায়নের অতীত, বর্তমান, বিশ্বায়নের অর্থ, বিশ্বায়নের উপকারভোগী ও বিপন্ন অংশ, সঙ্কটসমূহের বিস্তৃত বর্ণনা করেন। বিশ্বায়নের বহি:প্রকাশকে উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক স্বার্থের সমন্বয়রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। তবে, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারের বিকাশের সাথে ১৯৭০-এর দশকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংহতি প্রক্রিয়া বেগবান হয়। ১৯৮০-এর দশকের ঋণ সঙ্কটকালে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের ঋণ পাওয়ার যোগ্য হওয়ার জন্য অনেকগুলি উন্নয়শীল দেশ স্থিতিশীলকরণ ও কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচী নামক পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করে। এসব কর্মসূচী ছিল উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাজার উদারীকরণের শর্তাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণীত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা তদারকির লক্ষ্যে WTO, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক সৃষ্টি হয়। বহুজাতিক সংস্থা যা সংক্ষেপে TNC নামে পরিচিত জাতিরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশের অনুকূলে এ সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় বহুমুখী তৎপরতা শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি, নরওয়ে যারা নিজেদের প্রতিযোগী ছিল। তাদের সমন্বিত প্রয়োজনীয় বাণিজ্যের লক্ষ্য হলো তৃতীয় বিশ্ব। নতুন বিশ্বব্যবস্থায় উৎপাদন ও উন্নয়নের ভূ-রাজনৈতিক স্থানটি হলো অনুন্নত দেশগুলো। কল্যাণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থার

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য প্রচার করে ঋণদান, পরামর্শদান এবং NAFTA-এর মতো সামরিক শক্তি প্রদর্শনের ভয়-ভীতি দেখানো হলো। লেখক বলেন, তৃতীয় বিশ্ব স্বেচ্ছায় অনেকাংশে বিশ্বায়নের পথিক হলো। বিশেষত উচ্চবিত্ত, মেধাবী ও দক্ষ শ্রমিকশ্রেণী ভাগ্যের পরিবর্তনে কাজের সুযোগ পায়। খাদ্য, পোশাক, বিজ্ঞান, কলা, প্রযুক্তির ব্যবহারের একটি শ্রেণী বিত্তশালী হয়। যারা বিলাসিতায় আভিজাত্যপূর্ণ জীবন-যাপনকে স্বাগত জানায়। আধুনিকতার সংজ্ঞায় এ শ্রেণীটি বিশ্বায়নের পক্ষে অবস্থান করে। কিন্তু লেখক বলেন, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ নিম্নবিত্ত। উপরের ১০ শতাংশ মানুষের ভোগ-বিলাসের চাহিদা মেটাতে শ্রমিকরা আরও বেশি শ্রমে নিয়োজিত হয়। এ পর্যায়ে মিল, কারখানায় তাদের সাময়িক কাজের সুযোগ মিললেও দীর্ঘস্থায়ীভাবে ভাগ্য পরিবর্তনে তা আদৌ প্রভাব রাখে না। উপরন্তু জাতিরাষ্ট্রগুলোর ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানার উৎপাদিত শিল্পগুলো উন্নত দেশের উন্নত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। দেশীয় শিল্পের বিকাশ হয় না। বহুজাতিক সংস্থাগুলো এক দেশে মুনাফা অর্জন করে অন্যত্র স্থানান্তরিত হলে কর্মহীন হয়ে পড়ে বহু মানুষ। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তৈরি হয় হতাশা। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রটি এ পর্যায়ে ঋণ গ্রহণ করে, ঋণের পাশাপাশি কিছু শর্তপূরণের বাধ্যবাধকতাও গ্রহণ করে। এ শর্তগুলোর অন্যতম হচ্ছে শিল্পের বেসরকারিকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিশু অধিকার রক্ষা, শিক্ষাখাতে সংস্কার প্রভৃতি। ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রতিটি কাজে সুদ ও শর্তসাপেক্ষে ঋণ প্রদান করে। একদিকে সুদের বোঝা বাড়তে থাকে, অন্যদিকে সংস্কার কর্মসূচীর সমাপ্তির আগে নতুন কর্মসূচী গৃহীত হয়।

অবিচার বন্ধকরণে অতি বিশ্বায়নপন্থীদের কার্যকলাপের বিপক্ষে লেখকের বিশ্বায়নবিরোধী পর্যালোচনাগুলো যুক্তিযুক্ত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার প্রাক্কালে অর্থনৈতিক দূরাবস্থা নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর ভূমিকা এক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা যায়।

'বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পি.আর.এস.পি.) মূল প্রতিপাদ্য ও বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক বইটি সিপিডি'র (২০০৬) প্রকাশনায় লিখেছেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও সাঈদ আহমেদ। দারিদ্র্য নিরসন উদ্যোগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, উন্নয়ন-সাহায্য-বিতর্ক এবং বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষাপটে পিআরএসপি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার পাশাপাশি লেখকদ্বয় পিআরএসপি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা করেছেন। বইটিতে জানা যায়, বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্য নিরসন ও প্রবৃদ্ধি সুবিধা বা পিআরজিএফ-এর অনুমোদন, পর্যালোচনা অথবা বিশ্বব্যাংকের 'আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা' (IDA) এর আওতায় সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তি, সবকিছুই নির্ভর করে আইপিআরএসপি, পিআরএসপি অথবা বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের সাফল্যের উপর। ২০০২ সালের জুলাই থেকে এ প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই সকল IDA-ভুক্ত দেশে ঋণ প্রাপ্তির নীতিমালা প্রণীত হচ্ছে।

লেখকদ্বয় তুলে ধরেন যে, বাংলাদেশ যেভাবে প্রচলিত 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' পদ্ধতিকে বাতিল করে পিআরএসপি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অথচ, অনেক দেশ তার পরিবর্তে তাদের প্রচলিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কর্মসূচিকেই পিআরএসপি কাঠামোতে একীভূত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, নেপাল তাদের প্রচলিত মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় প্রণীত 'দশম পরিকল্পনা' (The Tenth Plan) কেই পিআরএসপি হিসেবে জমা দিয়েছে। অন্যদিকে ভারত কোন নুতন পিআরএসপি প্রণয়নে অস্বীকৃতি জানায় এবং এই যুক্তি উত্থাপন করে যে, তাদের চলমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেই দারিদ্র্য নিরসনের ইস্যুটি যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে।

বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী সর্বদাই তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রগুলোকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে এবং পরিকল্পনা দলিলে সেগুলোর অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্যে চাপ প্রয়োগ করে থাকে। এমতাবস্থায় বর্তমান পিআরএসপি আটটি ক্ষেত্রকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে অভিহিত করেছে। খসড়া পিআরএসপি প্রণয়নের সময়ও ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরের লক্ষ্যকে একাধিকবার পরিবর্তন করা হয়েছিল। প্রতিবছর প্রকৃত অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে নুতন বেঞ্চমার্ক নির্ধারিত হবে, যা সাময়িক অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের কাজকে বেশ কষ্টসাধ্য করে তুলবে।

সমালোচনায় বলা যায়, পিআরএসপি বাস্তবায়নের সফলতা অনেকাংশেই নির্ভর করবে সুশাসন, দুর্নীতি দমন ও প্রশাসনিক সংস্কার ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে অগ্রগতির ওপর। এই অগ্রগতি সফল করতে বিশ্বব্যাংক ও দাতা সংস্থাগুলো নতুনভাবে যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও অন্যান্য সংস্কারের জন্য পরামর্শ দান করে, সেটি উল্লেখ করা হয় নাই। পিআরএসপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। অর্থায়নের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য দেশের মোট বিনিয়োগ ২০০৯ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৬ শতাংশে উন্নীত করতে হয় যার অনেকটাই আসে বৈদেশিক ঋণ থেকে। তবে, বৈদেশিক সাহায্যের একটা বড় অংশ কনসাল্টিং ফি ও সার্ভিস ট্যাক্স হিসেবে ফেরত দিতে হয়েছে। তাই বৈদেশিক সাহায্যের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে অভ্যন্তরীণ সম্পদ তৈরীর ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অথচ দেশীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্থানে জায়গা করে নিচ্ছে বিশ্বব্যাংক অথবা আইএমএফ নির্ধারিত উন্নয়ন ভাবনা। এই প্রেক্ষাপটে জাতিরাষ্ট্রের নিজস্ব পরিকল্পনার সার্বভৌমত্ব অতি সহজেই বৈদেশিক সাহায্যের ছত্রছায়ায় পরিবর্তিত হয়। এই প্রেক্ষাপটগুলো বইটিতে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয় নাই।

আনু মুহাম্মদ (২০১১ঃ৭১ ; আভ্রামোভিক, ১৯৯১) 'বিশ্বায়ন' শব্দ দিয়ে যে বিশ্ব প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে নির্দেশ করা হয় সেই প্রক্রিয়ারই গভীর বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের সম্পর্কের ধরন, এসব দেশে ব্যাংক সমর্থিত প্রকল্প-জটিলতার স্বরূপ। আভ্রামোভিককে উদ্ধৃতি করে তিনি বিশ্বব্যাংকের আরোপিত বিভিন্ন শর্ত পরীক্ষা করে এগুলোকে চারভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো :

ক) চাহিদা শর্ত : এর মধ্যে আছে সরকারি ব্যয়হ্রাস, মুদ্রা অবমূল্যায়ন, সুদের হার বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য উদারীকরণ।

খ) যোগান শর্ত : প্রাথমিকভাবে এটি প্রকল্প মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের মধ্যেই সীমিত ছিল। কিন্তু কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসুচি চালুর পর এটি সমগ্র অর্থনীতিকেই নিজের আওতায় নিয়ে নিয়েছে। এর কেন্দ্রীয় মনোযোগ হচ্ছে বিনিয়োগ কর্মসূচী, ভর্তুকি ব্যবস্থা, দাম নির্ধারণ, অর্থকরী ও বাণিজ্য উদারীকরণ ।

গ) প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি : বেসরকারি খাতকে অধিক স্বাধীনতা, তাদের ভর্তুকি প্রদান এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের হাতে দিয়ে দেয়ার বিষয়গুলো এর অন্তর্ভূক্ত।

ঘ) আড়াআড়ি শর্ত : একটি খাতে অর্থযোগানের শর্ত হিসেবে অন্য কোনো খাতে কোন সংস্থা বা রাষ্ট্রের শর্ত মানতে বাধ্য করা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেকটি স্তরের শর্তারোপের সুযোগ থাকে। তাছাড়া প্রতিটি অনুন্নত দেশের 'এইড ক্লাব' যেহেতু বিশ্বব্যাংকেই নেতৃত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, সেহেতু অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থে পরিচালিত প্রকল্পের ওপরও বিশ্বব্যাংকের কর্তৃত্ব থাকে। আলোচ্য গ্রন্থে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নেতিবাচক আলোচনা থাকলেও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার মৌলিক প্রতিষ্ঠান যেমন ঃ সরকার ব্যবস্থা, জনগণের ভূমিকা, কূটনৈতিক দক্ষতা প্রভৃতি বিশ্বব্যাংকের কাছে কেন নতি স্বীকার করে সেটি স্পষ্ট করে বিশ্লেষণ করা হয় নাই।

স্টিগলিৎস (২০০৫) বিশ্ব অর্থনীতিতে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ যেভাবে কাজ করে তার অভ্যন্তরীণ নীতিগত কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, পূর্ব এশিয়ার সমস্যা সমাধানে সরকারি পর্যায়ে মিতব্যয়িতা দেশের অর্থনীতিকে আরও পঙ্গু করে তুলতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাঁর বক্তব্য হলো যে, উঁচু হারে সুদের ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই সুনিশ্চিত হবে। যোসেফ স্টিগলিৎস স্পষ্ট করে বলেন, দাতা সংস্থাগুলো সহায়তা প্রদানের সময় বিভিন্ন দেশের তরফ থেকে যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সেই সময় কিছু বিশেষ শর্তের কথা আলোচনা করে। কিন্তু সেই সময় যে বিরামহীন আলোচনা হয় তাতে তাঁদের কথাই শিরোধার্য বলে গৃহীত হয়। শুধু তাই নয়, দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সহমত তৈরি হতে যে ন্যূনতম সময় প্রয়োজন তাও তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবেই দেন না। এর ফলে, ঠিক কোন্ শর্তের বিনিময়ে একটি দেশ তাঁদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করল, তা সংশ্লিষ্ট দেশের সংসদ বা সমাজের অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে, তবে গ্রহণ করা আর সম্ভবপর হয় না। আবার অনেক সময় তাঁরা তাঁদের তথাকথিত স্বচ্ছতা সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে গোপন সমস্ত শর্তকে সামনে রেখেই আলোচনা শুরু করেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আলোচনার সত্যতা উদঘাটন করতে বেসরকারিকরণ, সেবাখাত ও শিল্পখাতে কিছু শর্ত বিশ্লেষণ করার সুযোগ পাওয়া যাবে এই পুস্তক পর্যালোচনার মাধ্যমে।

কাভালজিৎ সিং (২০০৫: ১১৪) তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন 'রাষ্ট্রের দিন শেষ হয়ে গেছে, রাষ্ট্র এখন ক্ষমতাহীন, এ ধরনের মন্তব্য কতগুলো ভুল ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।' তিনি বলেন, যদিও বিশ্ব অর্থনীতি এখন জাতি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। একই সাথে এক্ষেত্রে কতগুলি আন্ত:রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বের বহুদেশে

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের বাণিজ্য বিস্তার করতে সক্ষম। বহুজাতিক কোম্পানি নিজ রাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে সহজেই অন্য রাষ্ট্রের ব্যবসায়িক লাভটুকু নিজেদের পকেটে নিয়ে যায়। অন্য রাষ্ট্রের জাতীয় সরকার মুক্তবাজারের নামে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তিনি দেখিয়েছেন, বহুজাতিক পুঁজি কীভাবে সকল ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। যেসব দেশের অভ্যন্তরীন বাজারের আয়তন অনেক বড় তারা আন্তর্জাতিক পুঁজির সাথে দর-কষাকষির মধ্য দিয়ে ভাল সুবিধা আদায় করে নিতে পারে, যেমন: চীন ও ভারত। ক্ষুদ্র আয়তনের বাজার সমন্বিত দেশগুলি তা পারে না, যেমন: বাংলাদেশ ও ইথিওপিয়া। বৈশ্বিক পুঁজিবাদের প্রেক্ষাপটে বাজারব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে রাষ্ট্রে সেজন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো সৃষ্টি করেছে। তার মতে, যেসব দেশ একে অপরের সাথে গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্কের জালে আবদ্ধ, সেসব দেশে সরকারি ব্যয় কমার বদলে দিন দিন বেড়েই চলেছে। দেখা যায় বেসরকারিকরণের ফলে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। আবার তিনিই বলেছেন, বিশ্ব অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে কতকগুলি একক ভূখণ্ডে যেকোন সিদ্ধান্তে শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন হস্তক্ষেপ পাওয়া যায়। কাভালজিৎ সিং স্বীকার করেন, যেহেতু রাষ্ট্র ও পুঁজি এ দুটি সত্ত্বার যৌগিক অবস্থান ভিন্ন। তাই এ দু'য়ের দ্বন্দ্ব নিরসন হওয়ার নয়। বহুজাতিক পুঁজির একমাত্র লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন; আর রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো নানা ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে নাগরিকদের চাহিদা পূরণ করা। বিশ্বায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রের দ্বারস্ত হবে। অর্থাৎ বাজার যত বেশি মুক্ত হবে সরকারি হস্তক্ষেপের মাত্রা তত বেশি বাড়তে থাকবে। কেননা বিশ্বায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব সরকারের উপরেই বর্তাবে। আমরা বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গঠন কাঠামোতে দেখতে পাই চাঁদার হারের ওপর ওই সমস্ত সংস্থার সদস্যদের হার নির্ধারিত হয়। তাই উন্নত বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অপেক্ষা স্বভাবতই বেশি। বলা বাহুল্য, বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মালিক তাদের স্বার্থেই বাণিজ্য সম্পর্কিত বিনিয়োগ ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ নীতিমালা ও গ্যাটের চুক্তিগুলো বাস্তবায়ন করে। উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বিশ্বায়নের বিকাশে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ যেভাবে প্রভাবিত হয় আলোচিত গবেষণার শুরুতে সেই সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তুহিন (২০১২) বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ বছর মেয়াদি চার ধাপের একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। যার আলোকে দেশের উচ্চ শিক্ষা ক্রমান্বয়ে বেসরকারিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। লেখক তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ইউজিসির দেয়া কৌশলপত্র মূলত বিশ্বব্যাংকের করা কৌশলপত্রের কপি পেস্ট। এই প্রকল্পে ইউজিসি শুধু বিশ্বব্যাংকের ঋণই নেয়নি, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারি ভর্তুকি তুলে দেয়ার সুপারিশ করেছে মঞ্জুরি কমিশন। ভর্তুকি তুলে নেয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হবে। এ খাতগুলো কৌশলপত্রে নির্ধারিত করা হয়। প্রথমত: বেতন ফি বৃদ্ধির পরামর্শ। ২০০৬ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত মোট তিন ধাপে পর্যায়ক্রমে বেতন ফি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বেতন ফি বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশি-বিদেশি ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে কৌশলপত্রে। শিক্ষার্থীদের ঋণ নিয়ে উচ্চ শিক্ষায় সমাপ্ত করার উপর জোর দিয়েছেন কৌশলপত্রের নির্মাতারা। সেক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীকে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে ব্যাংক থেকে মোটা অংকের ঋণ গ্রহণ করতে হবে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেছেন, একজন শিক্ষার্থীকে ব্যাংক ঋণের ভার তার শিক্ষাজীবন শেষেও বয়ে বেড়াতে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি কমিয়ে নেওয়ার যে কথা ইউজিসি'র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তা বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত শিক্ষা অধিকার পরিপন্থী। লেখক ইত্যাদি বর্ণনার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার শাসন সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা তুলে ধরেন। আমার গবেষণায় বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান চিত্র তুলে ধরতে বিশেষত সরকারের করণীয় সম্পর্কে সুপারিশসমূহ চিহ্নিত করতে লেখকের বিশ্লেষণ সাহায্য করবে। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত সমস্ত ছাত্রসমাজের ভবিষ্যত নির্ধারণ করে। শাসন সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্তগুলো পর্যালোচনা করার জন্য উপরোক্ত গবেষণাটি পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বায়ন সম্পর্কিত পুস্তকগুলো পর্যালোচনা করে এ সম্পর্কিত তিন ধরনের বিতর্ক দেখা যায়। আনু মুহাম্মদ, জোসেফ স্টিগৎলেজ, Steven P. McGiffen-এর বক্তব্য থেকে বিশ্বায়নের বিকাশ ও তৃতীয় বিশ্বে এর প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে। আনু মুহাম্মদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের মত ছোট রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পুঁজির সাথে মুক্তবাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা করে কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের আইন দ্বারা নির্ধারিত হয় না। জোসেফ স্টিগৎলেজ দেখিয়েছেন, দাতাদের প্রদত্ত ঋণ কীভাবে গ্রহীতা রাষ্ট্র শর্তের বিনিময়ে গ্রহণ করে। বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

প্রেক্ষিতে আরিফুজ্জামান তুহিন ও দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের গবেষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সুশাসনের অন্তরায় কী? পিআরএসপি গ্রহণের ফলাফল ও শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত কৌশলপত্র প্রভৃতি কীভাবে কাজ করছে সেসব আলোচিত হয়েছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য উপরোক্ত অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা এ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত।

১.৪ গবেষণা সমস্যার বিবরণ

গবেষণা সমস্যা নির্বাচনে সাহিত্য পর্যালোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। এই অংশে সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণা সমস্যাটি নিরূপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিশ্বায়নের ফলে কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে এবং কী প্রভাব ফেলছে এ বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাসনের শর্তাবলীর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে এ ক্ষেত্রে বেছে নেয়া হয়েছে।

বিশ্বায়ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। গবেষকরা এই পরিবর্তনগুলোর ফলাফল নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। অতি বিশ্বায়নপন্থীরা (Ohmae, Yea Gueherno, Yee Rich, Boyer) বিশ্বায়নকে ইতিবাচক মনে করেন। তাদের মতে, বিশ্বায়ন বিশ্বের সকল প্রান্তকে কাছাকাছি এনেছে। এর বিপরীত মত প্রদান করেন সংশয়বাদীরা। Hirst, Ruigrok এবং Tulder; উপমহাদেশে কাভালজিৎ সিং, রতন খাসনবিশ, উৎসা পট্টনায়ক এদের মধ্যে অন্যতম। তাদের মতে, জাতিরাষ্ট্রগুলো সাহায্য প্রাপ্তির আশায় বাধ্য হয়ে সুশাসন সংক্রান্ত শর্তগুলো গ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলেও দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো তৃতীয় বিশ্বরূপেই পরিচিতি পায়। এ দু'টি মতের বাইরে অপর একটি মত রূপান্তরবাদী তত্ত্ব নামে পরিচিতি পেয়েছে। তাদের মতে বিশ্বায়নের প্রকৃতির উপর জাতিরাষ্ট্রের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরা বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে নয় তবে, অসম বিশ্বায়নের বিপক্ষে। এদের মধ্যে অন্যতম Rosenau, MacMillar, Giddens, Nierop, জোসেফ স্টিগৎলেজ, রিচার্ড ডব্লিউ ফিশার, ডব্লিউ মিশেল বক্স ও অমর্ত্য সেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রূপান্তরবাদী তত্ত্বের প্রতিফলন পাওয়া যায় আহমেদ (২০০১)-এর বক্তব্যে। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা, সংসদীয় ব্যবস্থার সংস্কৃতি, আমলাতন্ত্র ও সুশীল সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। একই সাথে বিশ্বায়নের অনুপ্রবেশ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের যে দুর্বলতার সুযোগে বিতর্কিত হয় সেটিরও একটি ব্যাখ্যা দেন। আহমেদ (২০০১) বিশ্বায়নের রূপান্তরবাদীদের ন্যায় বলেন, জাতিরাষ্ট্রগুলো বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নের বাইরে অবস্থান করতে পারেন না। তবে রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের শক্তিশালী অবস্থানে উন্নীত করতে পারলে বহুজাতিক, বহুপাক্ষিক দাতাগোষ্ঠীর সাথে দরকষাকষির মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতার পরিবর্তন করতে পারে। এজন্য প্রয়োজন আইনসভার সংস্কার, শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ এবং উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম যুগের অর্থনৈতিক দর্শনের উল্লেখ করে আহমেদ (২০০১) বলেন, সংবিধানের মূলনীতি 'সমাজতন্ত্র' মতাদর্শে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা বৃদ্ধি করে চলেছিল। যদিও দেশটি আবার সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে পুরোপুরি পরিচালিত হয়নি। একদিকে ধনী, সম্পদশালী দেশগুলোর সাহায্য পাওয়ার আকাঙ্খা, অন্যদিকে অর্থনীতির নাজুক পরিস্থিতি এক পর্যায়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র ও দাতাগোষ্ঠী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। বাংলাদেশ এই সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই তার যাত্রা শুরু করে। আহমেদ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের উদাহরণ দিয়ে বলেন, ১৯৯১ পর্যন্ত ভারত সরকার দেশীয় বাজার উন্মুক্ত করে নাই। অভ্যন্তরীণ শিল্প সমৃদ্ধকরণ এবং বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি অর্জন করার পরেই বিশ্বায়নের উদারীকরণের পথে রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা অপসারণ করে। ফলাফল স্বরূপ আন্তর্জাতিক মহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একপাক্ষিক মতামত প্রাধান্য পায় নাই। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বায়নের রূপান্তরবাদী বক্তব্যকে সমর্থন করে। কিন্তু তিনি সংশয়বাদীদের মতো রাষ্ট্রের শক্তিমত্তা বিভিন্নভাবে নয়া উদারতাবাদের আলোকে পরিবর্তিত হয় বলে সংশয় প্রকাশ করেন। সবশেষে লেখকের বক্তব্য হচ্ছে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে গুরত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে যারা জনগণের প্রতিনিধি তাদের মতামতের ভিত্তিতেই দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জনগণের প্রতিনিধিদের নিরপেক্ষতা ও দূরদর্শিতার অভাবের মতো অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলো বহি:বিশ্বে বাংলাদেশকে সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব সত্যতাকে তুলে ধরে। সুশাসনের ব্যত্যয় ঘটেছে এই অভিযোগে দাতা দেশগুলো নিজেদের আমদানি এদেশ থেকে কমিয়ে দিতে পারে। সুতরাং, রাষ্ট্র নিজেও বিশ্বায়নের সুফল পেতে প্রায়শই অসামর্থ্য হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কালাম (২০০২) বাংলাদেশে বিশ্বায়নের অনুপ্রবেশ, বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব, প্রভাব ও বাংলাদেশের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বা, ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, ধর্মীয় সহাবস্থান, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, কূটনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বায়ন বহুমাত্রার সমন্বয় সাধন করে। এ গবেষণায় বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কারের পরামর্শ গ্রহণকে দেখানো হয়েছে। বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ গ্রন্থে লেখক বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে আন্ত:এশিয়ান হাইওয়ে, অভিন্ন নদী ব্যবহার, পরিবেশ বিপর্যয় ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন। অর্থনীতিতে পরিকল্পনা গোটা বিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনার আলোকে নির্ধারিত হয়। লেখক বলেন, বিশ্বায়নের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে বিশ্বের সকল জাতিই পরনির্ভরশীলতা কমায় অথবা যেকোনভাবে লাভবান হয়। জাতিরাষ্ট্রগুলো বিশ্ব বিস্তৃত প্রতিষ্ঠান, শক্তিশালী বহু মাধ্যমের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার ফলে রাষ্ট্রে কিছু পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়। যেমন: কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ, রাজস্ব বৃদ্ধি, কল্যাণমুখী কার্যক্রম প্রভৃতি। আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশ সম্পর্কে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনাগুলোর একটি হলো সুশাসনের অভাব। সুশাসনের অভাবে বিরাজমান বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যাগুলোর উত্তরণে অত্যন্ত ধীর গতিতে সংস্কার কার্যক্রম চলে। লেখক বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের সংস্কারস্বরূপ বিদেশী পরিকল্পনা গ্রহণের উদাহরণ দিয়েছেন। সামাজিক নিরাপত্তাজাল, কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী (SAP)। ব্রেটনউড প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত বেসরকারিকরণের মতো কর্মসূচীগুলো বাংলাদেশে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ধনী-দরিদ্র্যের বিশাল ব্যবধান প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার পরিমাপকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে। যেমন: গার্মেন্টস্ খাত বিকাশের ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলেও পোশাক শিল্পের প্রযুক্তি, সুতা সবই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। বৃহৎসংখ্যক নিম্নবিত্ত শ্রেণী কাজের সুযোগ পেলেও স্বল্প পারিশ্রমিক এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে। সংস্কৃতি, পরিবেশ, অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি সর্বস্তরে বিশ্বায়নের বিস্তার সামজিক মূল্যবোধ ও জাতিসত্তা যেভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে তার বিনিময়ে যেসব সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে লেখক সে সকল বিষয়ের বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পরিবেশবাদী সংগঠন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রতিবছর ইন্টারনেট এবং পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে WTO,

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর বাৎসরিক সভায় কর্তৃত্ববাদী সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে। বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে লেখকের সংশয়বাদী দৃষ্টি গবেষণাটির সমস্যা অনুধাবনে সহায়তা করে।

তুহিন (২০১২) বলেন, উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত 'হেকেপ' নামক একটি কৌশলপত্র পরিচালনা করছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিটি বিভাগে তাদের মানের মূল্যায়নের জন্য তথ্য সরবরাহ করবে এবং এজন্য বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। ফলাফল মূল্যায়নে যে বিভাগগুলো প্রথম সারির সে সকল বিভাগ বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অর্থ সাহায্য পাবে। লক্ষ্য করা গেছে চাকুরির বাজারে এগিয়ে থাকা বিভাগগুলোতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ বেশি। এ সমস্ত বিভাগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না হলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিভাগগুলোতে অর্থের বিনিময়ে সহজেই ভর্তির সুযোগ মেলে। ফলে, বিগত দেড় যুগে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় আশি'র কাছাকাছি। দেশের উচ্চ শিক্ষা ক্রমান্বয়ে বেসরকারিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করায় শিক্ষা গ্রহণের ব্যয় যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি লেখক তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারি ভর্তুকি তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছে এই উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠান। এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে জাপানসহ অনেক দেশে কলা এবং সামাজিক বিজ্ঞানে অনুষদের অনেক বিষয় যেমন দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতিতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ কমেছে। ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়গুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও সনদধারী শিক্ষার্থী যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি গুনগতমান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নেও আমরা উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণ দেখি। এ সকল প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভালো ফলাফল অর্জন। উপবৃত্তির মতো বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের পরিমানগত সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ভালো ফলাফলের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। সৃজণশীল প্রশ্নমালা ও গ্রেডিং পদ্ধতির নতুন ব্যবস্থাপনায় দেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে অতি ভালো ফলাফল দেখা যায়। ৫ম শ্রেণি, ৮ম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা সংযোজন শিক্ষার্থীকে ফলাফল কেন্দ্রীক প্রতিযোগীতামুখী করে তোলে। নয়া উদারতাবাদী বিশ্বায়নের বাজারে শুধুমাত্র ভালো ফলাফল একটি উচ্চ বেতনের চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করে। সরকার ভালো ফলাফলকে নিজেদের শাসন ব্যবস্থার ইতিবাচক অর্জন ভেবে সন্তুষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করে। সুতরাং দেশে ক্রমাগত এ+ ও গোল্ডেন ফলাফলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিযোগীতার মনোভাব গুণগত মানের বৃদ্ধি করে না বরং সহজে বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য বাজারের গাইড বই ও প্রাইভেট নির্ভরতাকে উৎসাহ যোগায়। এভাবে বিদ্যালয়, টিউশন ফি ও গাইড বই এর জন্য শিক্ষা গ্রহণে অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়া সুনির্দিষ্ট করে বলা যায়, নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের প্রভাব বাংলাদেশ রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন গণপণ্য জনগণকে সরবরাহের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। প্রাথমিক শিক্ষা তেমনি একটি গণপণ্য। শিক্ষার পণ্যায়ন নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের একটি অনিবার্য পরিনতি। যার ফলে সনদধারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেলেও গুণগত মানের অবনয়ন এবং শিক্ষা গ্রহণে ব্যয় বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে। দাতাগোষ্ঠীরা শিক্ষকদের উন্নত জীবন-যাপনে সহায়ক সম্মানী প্রদান, দরিদ্র্যপ্রধান পরিবারের অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক অক্ষমতা দূর করা কিংবা অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়গুলোর কথা পিইডিপি-১ ও পিইডিপি-২ এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে নাই। এছাড়া ইংরেজি মাধ্যম, বাংলা মাধ্যম ও মাদ্রাসা শিক্ষা ছাড়াও এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে যে শিশুরা লেখাপড়া করছে তাদের শিক্ষা প্রদানের ভিন্নতার কথাও বলা হয় নাই। দাতাগোষ্ঠীরা বিশ্বায়নের নব্য উদারতার আলোকে বৈশ্বিক একক বাজার ব্যবস্থা সৃষ্টিতে বিনিয়োগ করে। এই বাজার ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য মুনাফা। মুনাফার জন্য শিক্ষার মতো মৌলিক বিষয়গুলোতে বেসরকারি বিনিয়োগ দেখা যায়। উচ্চ শিক্ষার জন্য যেমন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একের পর এক অনুমোদন শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বাজার চাহিদা অনুযায়ী কিছু বিষয়াবলীতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও সনদ বাণিজ্য নিয়ে প্রায়শই প্রতিবেদন দেখা যায়। বাংলাদেশ সরকারের সাথে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন দাতা সংস্থা দীর্ঘদীন ধরে কাজ করছে। বিভিন্ন প্রকল্প অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। গুণগত ও সার্বিক মানের উন্নয়নের প্রেক্ষিতে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি যে কাঠামোগত পরিবর্তন এনেছে সেটি আলোচনা জরুরী।

উপরের আলোচনায় বিশ্বায়নের রূপান্তরবাদী তাত্ত্বিকদের যুক্তিগুলো রাষ্ট্রের সক্ষমতার প্রশ্নে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবের মধ্যেও প্রতিযোগীতার মনোভাব বৃদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়েছে। এ প্রতিযোগীতায় জাতি রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সফলতা পেতে পারে। কিন্তু সংশয়বাদীরা মনে করেন

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগীতার কারণে রাষ্ট্র বিভিন্ন সেবাকে পণ্য পরিণত করতে বাধ্য হচ্ছে। দুটি বক্তব্যের প্রতিফলনে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের উন্নয়নে এই দুটি প্রভাব বিদ্যমান। প্রত্যেকের আলোচনায় তাত্ত্বিক বক্তব্যই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়নি। তাই আমি আমার গবেষণায় উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে চাই।

১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার চূড়ান্ত লক্ষ্য সার্বভৌমত্বের ওপর নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবকে ব্যাখা করা।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছেঃ

১) জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ওপর নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবকে ব্যাখা করা।

২) বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন কীভাবে প্রভাবিত করে তা ব্যাখা করা।

৩) সংবিধানে মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃত শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের মানের উন্নয়নে দাতাদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

১.৬ গবেষণার প্রশ্ন

১) নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ওপর কী প্রভাব ফেলছে ?

২) এই বিশ্বায়ন বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তকে কীভাবে প্রভাবিত করছে ?

৩) প্রাথমিক শিক্ষাখাতের ওপর এই প্রভাব কি কি ?

১.৭ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রভাবিত করছে। এই প্রভাবের একটি প্রক্রিয়া রয়েছে যা উন্মোচন করা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শক্তি পর্যালোচনার জন্য জরুরী এবং এই পর্যালোচনা থেকে যেনো এ দেশের নীতি-নির্ধারকরা শিক্ষা নিতে পারে। সর্বোপরি, এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব বিষয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মতো প্রাথমিক শিক্ষার প্রেক্ষাপটে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত ও সংশোধনের ধারণা পেতে গবেষণাটি যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে।

১.৮ গবেষণার অনুকল্প

১) বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় জাতিরাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলো ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করছে।

২) জাতিরাষ্ট্র এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে অভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও দক্ষতার বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে কিছুটা সক্ষম হয়।

৩) কিন্তু, চুড়ান্ত পর্যায়ে নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের ফলে শিক্ষার অধিকার পণ্যে রূপান্তরিত হয়, যা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়নি।

১.৯ গবেষণার পরিধি

এই গবেষণায় বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পিআরএসপি তথা দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র পরবর্তীতে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে আটটি লক্ষ্য পূরণে কাজ করছে তার একটি হচ্ছে- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন। বাংলাদেশে এই লক্ষ্য অর্জনে '৯০ দশক থেকে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয়। প্রাথমিক শিক্ষার মানের উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-১ (১৯৯৬-২০০৩) ও প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-২ (২০০৩-২০০৯)-এর পর্যালোচনা এই গবেষণা কর্মে করা হয়েছে।

১.১০ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি প্রথমত গুণগত। মাধ্যমিক উৎস থেকে কিছু পরিমানগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। দু'টি উৎস হতে এই গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক) প্রাথমিক উৎস : সাক্ষাৎকার পদ্ধতি।

Dhaka University Institutional Repository

খ) মাধ্যমিক উৎস : দলিলাদি বিশ্লেষণ (বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রভৃতির সংরক্ষিত রেকর্ডসমূহ)।

ক) সাক্ষাৎকার

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য আলোচ্য গবেষণার বিষয়টি 'বিষয় বিশেষজ্ঞ' ও 'শিক্ষক-আমলা' এই দুটি স্তরে বিভক্ত করে দুটি স্তর থেকে মোট ২৫ জন ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার জন্য এর অধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বিশ্বায়ন, সার্বভৌমত্ব, দাতাগোষ্ঠীর ভূমিকা বিশ্লেষণে একটি উন্মুক্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে 'বিষয় বিশেষজ্ঞ' হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক মোট ১০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বায়ন, সার্বভৌমত্ব ও দাতাগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণারত বিশেষজ্ঞদের মূল্যবান মতামত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নয়ন ইনিস্টিটিউটের পরিচালকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানের সার্বিক চিত্র তুলে ধরার জন্য 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষা অধিদপ্তরের আমলা' মোট ১৫ জনকে বেছে নেয়া হয়েছে। এই ১৫ জনের মধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ০৪ জন গবেষক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের ০৪ জন আমলা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ০৭ জন শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। ০৭ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষক ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩ জন (ব্রাক, Teach for America ও সুরভী বিদ্যালয়ের) শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক মানের অবস্থা জানার জন্য সরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে শহর ও গ্রাম পর্যায়ের বিদ্যালয়ের দুইজন করে মোট চারজন শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। (দেখুন, পরিশিষ্ট-২ এ গ্রুপ-ক এ'বিষয় বিশেষজ্ঞ' ও গ্রুপ-খ এ 'শিক্ষক-আমলা' এর পরিচিতি দুটি ভাগে বর্ণিত রয়েছে। পৃষ্ঠা নং-১০৬ ও ১০৭।)

Dhaka University Institutional Repository

খ) দলিলাদি বিশ্লেষণ

আলোচ্য গবেষণা কার্যটি পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক প্রকাশিত বার্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদনসহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সংরক্ষিত রেকর্ডসমূহ থেকে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। বেশিরভাগ তথ্যই সংগ্রহ করা হয়েছে মূলত সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য উপস্থাপনা ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে। এছাড়া রাষ্ট্র পরিচালিত সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) পরিচালিত জরিপ ও বিভিন্ন সময়ের জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় শিক্ষাবিদদের মূল্যায়ন থেকে বিশ্লষণ করা হয়েছে।

১.১১ অধ্যায়সমূহের বিবরণ

গবেষণাটি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : গবেষণা ও গবেষণা সম্পাদনের রূপরেখা- এই অধ্যায়ে গবেষণাটির লক্ষ্য উদ্দেশ্য, যৌক্তিকতা, সমস্যার বিবরণ ও গবেষণা পদ্ধতি ব্যাখা করা হয়েছে। সমগ্র গবেষণাটির প্রেক্ষাপট হিসেবে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বায়নের আলোকে বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো এখানে রচিত হয়েছে । নয়া উদারতাবাদ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, সুশাসন, শিক্ষাখাত ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বায়নকেন্দ্রিক বিতর্কের তিন ধরনের তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করে গবেষণাটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারাটি চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় এ পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়া দু'টি প্রকল্পের কর্মসূচি ও ফলাফলের আলোকে বর্তমান অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : এ অধ্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগিদের অংশগ্রহণ এবং তা রাষ্ট্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলে গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : গবেষণায় গৃহীত অনুকল্পটি সমগ্র তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের পরে কতটুকু সফল হয়েছে অথবা অনুমানটি ভুল ছিল কিনা তা পরীক্ষণ করা হয়েছে এবং উপসংহারে তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহার

বিশ্বায়ন শুধু একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া নয়; এটি একটি রাজনৈতিক প্রপঞ্চও। যার অন্তর্নিহিত বক্তব্য হচ্ছে- রাষ্ট্রের সীমানাকে মুছে না ফেললেও এর গুরুত্বকে দুর্বল করা। নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন সাম্প্রতিক বিশ্বের একটি বাস্তবতা। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজকে বাজারমুখী করা। শিক্ষার বাজারজাতকরণ তেমন একটি প্রক্রিয়া। নয়া উদারীকরণের পথে চলতে গিয়ে জাতীয় সমস্যাগুলো সমাধানে আন্তর্জাতিক সাহায্য-সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির গণ্ডিতে মিথস্ক্রিয়া তৈরী করেছে। এই গবেষণায় শিক্ষাখাতে আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠীর ভূমিকার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যেই গবেষণাটি পাঁচটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নব্য উদারতাবাদ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং শিক্ষাখাত ঃ একটি তাত্ত্বিক কাঠামো

ভূমিকা

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বহি:প্রকাশ ঘটে এর একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দ্বারা। বিশ্বায়নের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের এই ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জাতিরাষ্ট্রগুলোকে একই কাঠামোতে একত্রিত করার জন্য তৈরী হয়েছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন, শাসন ব্যবস্থার সংস্কার, দারিদ্র্য-দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পুঁজির সহজলভ্যতার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই নির্ভরশীলতা উন্নয়নশীল জাতিরাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বে কিরূপ প্রভাব ফেলে, এ বিষয়টির তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণই এই অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়।

২.১ নব্য উদারতাবাদ

নব্য উদারতাবাদ শব্দটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানিতে সর্ব প্রথম একদল অর্থনীতিবিদ ও পণ্ডিতদের দ্বারা উৎপত্তি লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ফ্রেডরিক আগস্ট ভন হায়েকের মাধ্যমে এটি সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল যা ব্যাপকভাবে আমেরিকান অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ফ্রেডরিক আগস্ট ভন হায়েক মনে করেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কখনো সংকীর্ণ বস্তুগত উপাদানের উপর সীমাবদ্ধ হবে না। বরং এটি রাজনৈতিক ও নৈতিক শক্তি যা মুক্ত ও স্বাধীন সমাজকে রূপায়িত করে।

অন্যদের দৃষ্টিতে উদারতাবাদের আধুনিকত্তর ভাষা হলো নয়া উদারতাবাদ। অষ্টাদশ শতাব্দীর 'Laisset-fair-talk' যা গুরুত্ব আরোপ করে ব্যক্তি স্বার্থ, অর্থনীতির দক্ষতা এবং লাগামহীন প্রতিযোগীতা (B. Steger ও K. Roy, ২০১০)। রোনাল্ড রিগ্যান, মার্গারেট থ্যাচার, বিল ক্লিনটন, টনি ব্লেয়ার, জন হাওয়ার্ড এবং জর্জ ডব্লিও বুশ প্রমুখ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের দ্বারা নব্য উদারতাবাদ ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়েছে । প্রত্যেকের মধ্যে নীতিগত মিল রয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতির বিনিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে উন্মুক্ত ও উদার করা এবং একটি একক বিশ্ব বাজার সৃষ্টি করা।

১৯৭০ সালে ল্যাটিন আমেরিকার একদল অর্থনীতিবিদদের দ্বারা 'নব্য উদারতা' শব্দটি উপ-বাজার মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনেকের মতে, নয়া উদারতাবাদ শব্দটি ওয়াশিংটন ঐক্যমতের সাথে জড়িত যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ওয়াশিংটনভিত্তিক তিনটি প্রতিষ্ঠান যথা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং ইউ এস

Dhaka University Institutional Repository

ট্রেজারি বিভাগের একটি সংস্কার প্যাকেজ। এই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিমালার একগুচ্ছ নির্দেশনা ও শর্তের একটি প্যাকেজ, যাতে তিনটি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

নব্য উদারতাবাদের নীতির উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯৮১ সালে রিগ্যান "যোগান সংশ্লিষ্ট দিক" কর্মসূচি ঘোষণা করেন। অধিক রাজস্ব বৃদ্ধিতে এই নীতি জনগণের উপর করের বোঝা চাপায়। ডেভিড স্টকম্যান এই অর্থনৈতিক কৌশলকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি মনে করেন, নব্য উদারতাবাদের অর্থনীতি প্রতিরক্ষার মতো বিষয়াবলীতে তথা সেনাবাহিনীর খরচ বৃদ্ধি করে যা অনিবার্যভাবে ঘাটতি বা অপচয়। সামাজিক কর্মসূচি, চিকিৎসা সেবা এবং মৌলিক চাহিদাগুলোতে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে উপদেশ দেয়। স্টকম্যানের এই নীতি নব্য উদারতাবাদের বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে। সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সামাজিক নীতি ও সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যার ফলে রাজস্ব ঘাটতির ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রশাসন শক্তি প্রয়োগ করে। ১৯৯৬ সালে বিল ক্লিনটন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং আমেরিকার জনগণের কাছে ঘোষণা করেন যে 'Big Government' এর দিন শেষ হয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন নব্য উদারতাবাদের যে ধারাগুলো রয়েছে তা সরকারের কার্যক্রমকে দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। সামাজিক কল্যাণের চুক্তিগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে কর্পোরেট দায়িত্ববোধ থেকে এবং সর্বোচ্চ পুঁজিবাদের সমন্বয়ে (B. Steger ও K. Roy, ২০১০)।

১৯৯০ সালে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার পরবর্তী সময়ে স্থানীয় রাজনীতিতে আধুনিকতাবাদ ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এর ফলে ইউরোপের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক গণতান্ত্রিক দলের নেতারা যেমন, ডাচ প্রধানমন্ত্রী উম কিম, ইতালির প্রধানমন্ত্রী রোমানো প্রোডিসহ ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এবং জার্মান চ্যান্সেলর নতুন বাম কর্মসূচী যুক্ত করেছিলেন। তাদের এই কর্মসূচী এবং একতাবদ্ধতা বিশ্ব বাজারে বাণিজ্য সম্পর্কে উদারতা এবং জাতীয় অর্থনীতিকে একত্রিত করতে চেষ্টা করেছিল। দেখা যায় বিশ্বের সর্বোচ্চ শক্তিরা বিশ্বায়নকে নব্য উদারতাবাদের আদর্শে এবং অর্থে ব্যবহার করেছেন। তারা দাবী করেন যে, এটি একটি যৌক্তিক প্রক্রিয়া এবং এটি বিশ্বে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও বস্তুগত উন্নয়ন সাধন করবে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সমাজে নতুন যে শ্রম সৃষ্টি হচ্ছে তা নির্ভর করে সামাজিক সুবিধার উপর

Dhaka University Institutional Repository

এবং এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অর্জন। এই স্লোগানের মাধ্যেমে জানানো হয় যে প্রাইভেট সেক্টরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সরকারের প্রবৃদ্ধির সমন্বয় করা হয়েছে। এটি সরকারের দায়িত্ব। এই স্লোগানের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক সেবা সম্পর্কে নাগরিকদের বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। তাই দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, বিশ্বব্যাপী নব্য উদারতাবাদ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে কারণ এটি জনগণকে বোঝাতে পেরেছে যে, এটি বিশ্বকে দারিদ্র্য মুক্ত করবে। ফলে বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ অনুন্নত দেশগুলোতে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যেমে নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করছে। অন্য একটি দাবী বিশ্বব্যাপি বিস্তার লাভ করে যে, আত্ম নিয়ন্ত্রিত বাজার হলো গণতন্ত্রের ধারনা এবং ব্যক্তি পছন্দের বিষয়। এটি পরামর্শ দেয় যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোর স্বাধীনতা নব্য উদারতাবাদের সাথে জড়িত।

নব্য উদারতাবাদকে তিনটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। যথা:

১) একটি মতাদর্শ : অধিক উত্তম বিশ্বের জন্য অপরিহার্য হাতিয়ার হিসেবে বিশ্বায়নের বাজারের একটি ইতিবাচক দিক বর্ণনা করে। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে প্রভাবশালী পুঁজিবাদী জনমত গঠন, চির প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কসবাদকে উপেক্ষা, বৈশ্বিক বাণিজ্য পুঁজির সচলতা, বিনিয়ন্ত্রণ, বেসরকারিকরণ, রাজস্ব ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা ও উদারীকরণ। মূলত অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ বাজার ব্যবস্থা। মুনাফার জন্য পণ্যায়ন।

২) শাসনের একটি ধারণা : শাসনের নির্দিষ্ট ধারণা যা বিশেষ যুক্তি এবং শক্তি সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যেমন : প্রতিযোগিতা, আত্ম স্বার্থ ও বিকেন্দ্রীকরণ। কৌশলগত পরিকল্পনা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য নকশা প্রণয়ন করে। প্রতিযোগিতামূলক বাজার দখলের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

৩) একটি পলিসি প্যাকেজ : নতুন জনব্যবস্থাপনায় সরকারের ১০টি উদ্দেশ্য। প্রতিযোগীতামূলক সেবার অনুপ্রেরণা, ভোক্তাদের প্রয়োজনীয়তার দিকে মনোযোগ, মিতব্যয়িতা, রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচন, বাজারের দ্বারা দর ওঠা-নামা ও বিকেন্দ্রীকিত সরকার ইত্যাদি (B. Steger ও K. Roy, ২০১০) ।

পৌনে এক শতাব্দী ধরে এশিয়ার দেশগুলোতে নব্য উদারতাবাদের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তবুও অনিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তি মালিকানাধীন মার্কেটভিত্তিক ধারণাগুলোকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণের দৃঢ়

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তিগুলো নব্য উদারতাবাদকে গতিময় করেছে। বেসরকারিভাবে যত বেশি বিনিয়োগ হয়েছে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ততো কমেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক চাহিদায় বেসরকারি বিনিয়োগ উচ্চহারে ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। উন্নয়ন কর্মসূচী এবং বৃহদাকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা সরকারের কল্যাণমূলক কাজে উদারনৈতিকতার প্রতিযোগীতা তৈরি করে। নব্য উদারতাবাদের নামে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সেবাখাতগুলো থেকে রাষ্ট্রের হাত গুটিয়ে নেওয়ার অর্থ হলো দরিদ্র জনগণকে সেবা থেকে বঞ্চিত করা। শিক্ষার মতো বিষয়গুলোতে অর্থায়নের গুরুত্বের কথা বলা হলেও, বেসরকারীভাবে বেড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খরচ বৃদ্ধি 'বিনিয়োগকৃত খরচ তুলে নেওয়া'র মতো কৌশলের প্রস্তাবসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনার দাবী রাখে।

২.২ বিশ্বায়ন ও জাতিরাষ্ট্র : আন্তঃসম্পর্কের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বিশ্বায়ন একটি বহুমাত্রিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার সমষ্টি যা প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিক্রমায় গড়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের প্রবক্তাগণ মনে করেন, এর ফলেই দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার দ্রুত মনোন্নয়ন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই সম্ভব । অর্থনৈতিক বিনিয়োগ বিশ্বায়নকে ত্বরান্বিত করছে। বিশ্বায়নের অপর একটি পরিচিত রূপ হচ্ছে মুক্তবাজার অর্থনীতির বৈশ্বিক রূপ। নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ, বেসরকারিকরণ এবং অধিকতর মুক্ত বিশ্ববাণিজ্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সংহতিকরণের অর্থ হচ্ছে বিশ্বায়ন (সিং, ২০০৫)। সুতরাং বলা যায় যে, বিশ্বায়নকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করা যায়, যা রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের পুরনো কাঠামো ও সীমানাকে অবলুপ্ত করছে। বিশ্বায়ন রাষ্ট্রীয় সীমানার গুরুত্বকে হ্রাস করছে, যা অর্থনৈতিক যোগাযোগ ও লেনদেন, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রেই ব্যাপকতর পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। ফলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক অবকাঠামো তৈরি হয়েছে। এই বৈশ্বিক কাঠামোটি প্রথমে উদারতাবাদ পরবর্তীতে নব্য উদারতাবাদের আলোকে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক যাত্রাকে ব্যক্তি ও শিল্পের বাজারমুখী কেন্দ্রীকরণে ধাবিত করে। সামাজিক সহযোগীতার নামে বিনিয়ন্ত্রণ, বেসরকারী বিনিয়োগ, পুঁজির সম্প্রসারণে মুনাফার বৃদ্ধিকে

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র লক্ষ্যে রূপান্তর করে (সার্নি, ২০১৪)। রাষ্ট্র কাঠামোর পরবর্তন অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের সম্প্রসারণে পণ্যায়নকে উৎসাহ দেয়। সুতরাং সামাজিক সম্পর্ক ব্যাপকভাবে বাজারজাত প্রতিযোগী মনোভাব নিয়ে স্বতন্ত্র সত্তার জন্য মুনাফার বৃদ্ধিতে প্রতিযোগী হয়ে উঠে। প্রতিযোগীতার এই তত্ত্বকে তিনটি প্রধান দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। ১) সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণবাদ : এর মূল কথা হলো বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো রাষ্ট্রসমূহকে বাধ্য করে গতিশীল পুঁজি ও মুনাফা বৃদ্ধিতে প্রতিযোগীতা করতে। ২) এককেন্দ্রাভিমুখতা : নব্য উদারতাবাদের কৌশল দ্বারা রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্দেশীয় প্রতিযোগীতায় সাড়া দেয়। সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিতে রাজনৈতিক অর্থনীতিও সেই সূত্রে পরিবর্তিত হয়। ৩) কল্যাণকর রাষ্ট্রের পতন : বাণিজ্যিকীকরণ অতি মাত্রায় প্রাধান্য পেলে সরকারী সেবা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীও পণ্যে পরিনত হয়। মুনাফার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বণ্টন ব্যবস্থা রাজনৈতিক অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনে। বেসরকারী বিনিয়োগ সরকারের হস্তক্ষেপের বিরোধীতা করে। অতি ভোগ অতি উৎপাদনমুখী অর্থনীতির সৃষ্টি করে। যোগানের বৃদ্ধি সরকারের মিতব্যয়িতার জন্য চাপ দেয়। রাষ্ট্র করের বোঝা বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মূল বিষয়গুলো ক্রমশ প্রতিযোগীতার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। ফিলিপ সার্নি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র থেকে প্রতিযোগী রাষ্ট্রে রূপান্তরের ফলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। প্রথমত, দীর্ঘদিন ধরে একই রকম স্বার্থ ও সম্প্রদায়গত বিষয়াবলী যা রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা পেয়ে এসেছিল তার বিলুপ্তি ঘটবে। দ্বিতীয়ত, উদার গণতন্ত্রের সংকট তৈরি। এর কারণ বৈশ্বিক শক্তিশালী নতুন শাসন কাঠামো বহুজাতিক কোম্পানি, বেসরকারী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে। সুতরাং জাতিরাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিকভাবে গড়ে ওঠা বৈশ্বিক শাসন কাঠামোর প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে। এককভাবে কোন রাষ্ট্রের এই ব্যবস্থা অথবা প্রতিযোগীতার বাইরে অবস্থান করতে পারবে না।

বিশ্বায়নের মূল কথা হলো অবাধ বাণিজ্য নীতি বা কৌশল অবলম্বন। অর্থাৎ এক দেশের বাণিজ্য অপর দেশের বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার, কিংবা বাধা-নিষেধ আরোপিত না হওয়ার যে প্রক্রিয়া, সেটিই হচ্ছে বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের প্রবক্তাগণ মনে করেন, এর ফলেই দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার দ্রুত মনোন্নয়ন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই সম্ভব। বিনিয়োগের অপর এক চালিকাশক্তি হিসেবে বিশ্বায়ন কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতিরাষ্ট্র নিয়ে বিশ্ব গঠিত। পণ্য, সেবা, পুঁজির বিনিময় ও পারস্পরিক সম্পর্ক জাতিরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি করে। বিশ্বায়ন ছাড়া অগ্রগতি অসম্পূর্ণ। এই বিশ্বায়নের প্রকৃতি অসম হলে বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক সিস্টেমে ও অগণতান্ত্রিকতা দেখা যায়। আমরা দেখেছি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যারা সমগ্র বিশ্বের বাণিজ্য নীতি, দারিদ্র্য, সুশাসন, ঋণের হার প্রভৃতি নির্ধারণ করে, সেসব প্রতিষ্ঠানের গঠন কাঠামো অগণতান্ত্রিক (সাক্ষাৎকার, মাহবুবুল মোকাদ্দেম আকাশ, ১৯ জুন ২০১৪)। ফলে সমগ্র বিশ্বে উন্নত ও অনুন্নত দেশের দুটো পক্ষ তৈরি হয়েছে। বিশ্বায়নের বাইরে থাকা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকাকে কেন্দ্র করে বিশ্বায়ন বিরোধী বিতর্ক দেখা যায়। এই গবেষণায় বিশ্বায়নকেন্দ্রিক ত্রিমুখী বিতর্কের আলোকে বিশ্বায়ন ও জাতিরাষ্ট্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণে আমার অবস্থানকে তুলে ধরা হবে।

Petras এবং Veltmeyer (২০০১) বিশ্বায়নের ঐতিহাসিক পদচারণা, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত প্রেক্ষাপটে জাতিরাষ্ট্রের বহুমুখী প্রত্যয়ের বিস্তৃত বর্ণনা করেন। Petras এবং Veltmeyer-এর দৃষ্টিতে, রাজনৈতিক অর্থনীতিতে তিনটি শ্রেণী বিদ্যমান। ১) বিশ্বায়নের সুফলভোগী; ২) বিশ্বায়নে প্রতিদ্বন্দ্বী; ৩) উভয় মতাদর্শে বিশ্বাসী (Petras এবং Veltmeyer, ২০০১)।

প্রথম শ্রেণিটি, অতীতের স্থানিকতা ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতার স্থানে আন্তর্জাতিকতা এবং স্বনির্ভরতার বদলে সব জায়গায় পারস্পারিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে সমর্থন করে। বিভিন্ন দেশের বিশ্বজনীন পরস্পর নির্ভরশীলতার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের গঠনকে সমর্থন করে। প্রতিনিয়ত বাজারের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই বিশ্বায়নের লক্ষ্য।

দ্বিতীয় শ্রেণিটিতে, বিশ্বায়নের বিরোধীরা সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রীয় কিছু পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থন দেন। লেখকের মতে, মুক্তবাজার কিংবা আমলাতান্ত্রিকতার জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে হলে দেশীয় ক্ষুদ্র অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে বৃহৎ অর্থনীতির উপযোগী করতে হবে। আর্থ-সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থা, প্রতিষ্ঠানগত উৎকর্ষতা, শ্রেণী বিন্যাস, জাতীয়তাবোধ, আত্ম:সচেতনতাকে দেশপ্রেমের আলোকে গড়ে তুলতে হবে। মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেখকদ্বয় বলেন, আইএমএফ অথবা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিরাট প্রকল্প এবং আন্তর্জাতিক দিক-নির্দেশনা বাস্তবায়নের অংশবিশেষ। ভারত, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ কোরিয়া আত্ম:সচেতনভাবে দেশীয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশ্বায়নের সুফল গ্রহণ করেছে। জাতিগঠন, স্থানীয় অর্থনীতির স্বনির্ভরতা, ঐক্যতা এবং জাতীয় সংগ্রামের সমন্বয়ই পারে বৈশ্বিক কর্তৃত্ববাদী শ্রেণীটির বিকল্প হিসেবে চিত্রিত হতে।

তৃতীয় শ্রেণিটি, বিশ্বায়নের ইতিবাচক বিষয়গুলি সমর্থন করে, কিন্তু নেতিবাচক প্রভাবগুলোরও প্রতিবাদ করে। কাজের জন্য স্থানান্তরের সুযোগ গ্রহণ করতে সমর্থন দেয়। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে উন্নত দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে উন্নত জীবনযাপন করতে পারে। ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের মতো উন্নততর সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন অনেককেই আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে, দূর্বল জাতিরাষ্ট্রগুলো মেধাবী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে না পারলে নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির বিকাশ করতে পারে না। পুঁজি ও শ্রমের গতিশীলতার কারণে স্বল্প বেতনের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় সীমানার বাইরে রাষ্ট্রীয় শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে। সকল কিছুই নির্ভর করে রাষ্ট্রের দক্ষতা ও শক্তির উপরে। বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানিতে শ্রমিকের দক্ষতার উপরে শ্রমের মূল্য নির্ধারিত হয়। আবার কাজের স্থায়ীকরণের অনিশ্চয়তা এবং স্বল্প পারিশ্রমিক শ্রমিক অসন্তোষ ও হতাশা বৃদ্ধি করে।

তিন ধরনের দৃষ্টিকোন থেকে বিভিন্ন বাস্তবতার আলোকে বিশ্বায়ন বিশ্লেষিত হয়েছে। বিশ্বায়ন তাই বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্নভাবে সমালোচিত আবার প্রশংসিত হয়েছে। জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সাথে বিশ্বায়নের এই ত্রিধারা কতটুকু সম্পর্কিত সেটি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশের শাসন সম্পর্কিত একটি ক্ষেত্র ‘প্রাথমিক শিক্ষা’-কে বেছে নেওয়া হয়েছে। ’৯০ দশকের প্রথম থেকেই বিশ্বায়নের অংশীদার আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। আমার গবেষণায় বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্যের ফলে রাষ্ট্রীয় যে নির্ভরশীলতা তৈরী হয়েছে তা ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাত্ত্বিকদের সমসাময়িক বিশ্বায়ন সংক্রান্ত তিন ধরনের বির্তকের বিষয়ে Held, McGrew, Goldblatt ও Perraton (১৯৯৯) আলোচনা করেছেন। নিচে তা বর্ণনা করা হলো:

অতি বিশ্বায়নপন্থী তত্ত্ব

এই মতবাদীদের আদর্শিক ভিত্তি নয়া-উদারনৈতিকতাবাদ। বহুজাতিক পুঁজির সাথে জাতিরাষ্ট্রের জটিল ও সক্রিয় সম্পর্কই বিশ্বায়নের আকার ও পরিধি নির্ধারণ করে থাকে। বিশ্ব একটি ছাতার নিচে একই প্রকার নিয়ম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হবে। রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার করবে। যেমন: রাজস্ব ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা, বিনিয়ন্ত্রণ, বেসরকারিকরণ ও উদারীকরণ। এ সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কেন্দ্রে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আইএমএফ বিশ্বব্যাংকের মতো সংস্থাগুলো প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বিশ্বব্যাপী ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার স্থান হিসেবে। সুতরাং বলা যেতে পারে, এক ধরনের বৈশ্বিক শাসনকাঠামো গড়ে উঠেছে। এরই ফলাফল স্বরূপ সাধারণ স্বার্থ সমন্বিত সচেতন গোষ্ঠীও প্রতীয়মান হয়, যাদের 'global civil society' বলা যেতে পারে।

সংশয়বাদী তত্ত্ব

বিশ্বায়নের ফলে উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন একই প্রভাব ফেলে না। বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমঝোতা-আলোচনা বা দরকষাকষির সর্বশেষ ঠিকানা আঞ্চলিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি। এই চুক্তিসমূহে যে সকল নীতি গৃহীত হয় তাতে আর্থিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো প্রভাব বিস্তার করে। অধিক অর্থের বিনিময়ে অধিক ভোটাধিকার পাওয়া ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের অনুকূলে নীতিমালা তৈরি করে। সুশাসন সংক্রান্ত ইস্যুগুলো সাহায্যপ্রাপ্তির শর্তরূপে পরিগণিত হয়। শর্তের বাধ্যবাধকতায় উন্নত রাষ্ট্রের পণ্য জাতীয় অর্থনীতিতে স্থান পায়। ফলাফল স্বরূপ দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্পগুলো ধবংস হয়ে যায়। সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়। তাই সংশয়বাদীরা বিশ্বায়ন ও গণতন্ত্রকে কতগুলি জটিল ও পরস্পর বিরোধী প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করেন। এই মতবাদের তাত্ত্বিকরা বলেন, বিশ্বায়ন যে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচলন চায়, সেটি পাশ্চাত্যের অনুকরণীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তারা মনে করেন উত্তর-দক্ষিণ,

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মাঝে ধর্ম ও ঐতিহ্যের বিভিন্নতা রয়েছে। সুতরাং পাশ্চাত্যের অনুকরণে সংস্কৃতির মিশ্রণ শুদ্ধ নয় বরং তা সভ্যতার সংঘর্ষকে ত্বরান্বিত করে।

সংশয়বাদীরা বলেন, বিশ্বের সর্বোচ্চ শক্তিরা বিশ্বায়নকে নব্য উদারতাবাদের আদর্শ এবং অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং তাদের এই প্রভাবশালী মতাদর্শকে বিশ্বায়নের পুঁজিবাদী বাজার বলে অভিহিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, সকল নব্য উদারতাবাদীরা দাবী করেন যে, বর্তমান সময়ে যে একত্রিত বাজার সৃষ্টি হয়েছে তা যৌক্তিক প্রক্রিয়া। এটি ব্যক্তিগত ও বস্তুগত উন্নয়ন সাধন করবে। ব্যক্তিগত মালিকানা ও কর্পোরেট স্বার্থ পুঁজি ও মুনাফা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা করে। সুতরাং এই ব্যবস্থা পণ্যায়নকে প্রাধান্য দেয়। রাজনৈতিক অর্থনীতিতে পরিবর্তন সাধনে জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী মতাদর্শের স্থায়ীকরণে শাসনের নির্দিষ্ট ধারণা ব্যবস্থাপত্র রূপে হাজির করে। এ ধরনের ব্যবস্থাপত্র বাংলাদেশ '৭০-এর দশকের শেষ থেকে এ পর্যন্ত বহু নামে গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল অনুন্নত দেশগুলোতে কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচী অথবা অন্য কোন নামে অংশ নেয়। তাই রাষ্ট্র কাঠামোতে এভাবে "নীতি নির্ধারণে মালিকানা" প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সংশয়ের দাবী রাখে।

রূপান্তরবাদী তত্ত্ব

এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সরকার ও সমাজ এমন এক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অবস্থান করছে, যেখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শব্দগুলোর মধ্যে খুব সামান্যই পার্থক্য সূচীত হয়। এর মধ্যে অর্থনীতি, সেনাবাহিনী, প্রযুক্তি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই রয়েছে। এদের মতে, কার্যত বিশ্বের কোন সমাজই আজ নিজ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। নিজ দেশের বাইরে বৃহৎ সমাজের সাথে সংযুক্ত। এই সমাজ সমকেন্দ্রীক নয়। তাই কিছু শৃংখলার জন্ম দেয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কেন্দ্র ও প্রান্তিক সম্পর্কের যে সূত্রের কথা প্রচলিত, সেটি মূলত ভৌগোলিক নয় বরং আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের ফলাফল। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, প্রথম ও তৃতীয় বিশ্ব বলতে কিছু নয় বরং পুরো বিশ্বের একত্রিত রূপ। প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে কিছু ছাড় দেয় আবার লাভবানও হয়। জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব শেষ হয়ে যায় না। সনাতন সার্বভৌমত্বের স্থলে সমঝোতার আলোকে শাসন ও

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃত্ব বণ্টন হয়। তাই জাতিরাষ্ট্র এককভাবে শাসন ও কর্তৃত্বের কেন্দ্র নয়। ইউরোপে সার্বভৌমত্ব স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভক্ত। এক্ষেত্রে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থকে সমন্বয় করে।

আমার মতে, বিশ্বায়ন নিয়ে উপরোক্ত তিন ধরনের বিতর্কের মধ্যে বাংলাদেশের বাস্তবতা বিশ্লেষণে সংশয়বাদী ও রূপান্তরবাদী তত্ত্ব অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

সংশয়বাদীরা বলেন, নব্য উদারতাবাদের সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কার্যাবলীর ধারণা পরিবর্তিত হয় এবং রাষ্ট্রকে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করে। ফিলিপ সার্নি এই প্রক্রিয়াকে তিনটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত, জাপান অথবা ফ্রান্সের মতো উন্নত রাষ্ট্রের উন্নয়নের কৌশলগুলোকে প্রয়োগ করে। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যের মতো উদারতাবাদের গোঁড়া সমর্থনে মুক্ত বাজার অর্থনীতির সম্প্রসারণ করে এবং তৃতীয়ত, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ে অংশীদারিত্বের অধিকার বাস্তবায়ন করে। যেমনটা জার্মান ও সুইডেনের মতো দেশগুলোতে দেখা যায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দেখা যায় উন্নয়নের জন্য উন্নত বিশ্বের অনুসরণ করা হয়। মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে '৮০-র দশক থেকে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগকারী কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। রুপান্তরবাদী বিভিন্ন মতবাদের তাত্ত্বিকরা বলেন, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার ফলাফলস্বরূপ সমসাময়িক বিশ্বায়ন বর্তমান রূপ লাভ করে। বাংলাদেশও এরই অংশ হিসেবে অনেক ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন করেছে। আধিপত্য নয় বরং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সকল দেশ আমদানি-রপ্তানিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে। ভোটাধিকার, অবাধ ও মুক্ত নির্বাচন, সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা, পোশাক শিল্পের মজুরি বৃদ্ধির মতো প্রস্তাবগুলো বিশ্বায়নের ইতিবাচক ফলাফল। বাম তাত্ত্বিকদের মতে, শিল্পের বেসরকারিকরণের ফলাফলে ক্ষুদ্র শিল্পের ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়েছে। কিন্তু আহমেদের (২০০১) মতো রূপান্তরবাদীরা মনে করেন, আদমজী জুট মিল বন্ধ হওয়া মানেই পাট শিল্পের ধ্বংস নয়। সুশাসন সংক্রান্ত ইস্যুগুলো বাস্তবায়ন মানেই পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও দুর্নীতিরোধ বেগবান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনকালীন পর্যবেক্ষক, দাতা সংস্থার সাহায্যের বিনিময়ে শর্তগুলো কার্যত উন্নয়ন ইস্যুকে সুশৃংখল করে।

বিশ্বায়নের রূপান্তরবাদীরা বলেন, বিশ্বব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এর মূলে রয়েছে বিশ্বায়ন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সরকার ও সমাজ এমন এক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অবস্থান করছে, যেখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শব্দগুলোর মধ্যে খুব সামান্যই পার্থক্য সূচীত হয়। তাদের মতে, সমসাময়িক বিশ্বায়ন ঐতিহাসিকভাবে নজিরবিহীন ধারাবাহিক প্রত্যয়। সংশয়বাদীদের মতো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে কিংবা বিশ্বায়নের গোঁড়া সমর্থকদের মতো ইতিবাচক দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্য বিশ্বায়নকে এককভাবে দায়ী বা সমর্থন করে না। বরং এরা মনে করে, বিশ্বায়িত বাজার ও বিশ্ব সভ্যতা উভয় মতবাদের সংযোগসাধন করে দীর্ঘ সময়ের ফলাফল।

২.৩ সার্বভৌমত্ব

ল্যাটিন শব্দ 'সুপারেনাস' (Superanus) থেকে ইংরেজি (Sovereignty) শব্দ এসেছে। সুপাররেনাস শব্দটির অর্থ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে রাষ্ট্রের অবিভাজ্য, নিরঙ্কুশ এমন এক ক্ষমতা বোঝায়, যার দ্বারা রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং বহি:রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ও প্রভাব থেকে রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র রক্ষায় চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্জন করে।

ঐক্য ও শৃঙ্খলার দাবি নিয়ে রাষ্ট্রের একাধিপত্যের তত্ত্বকে প্রচার করেন যাঁরা, তারা হলেন একত্ববাদী সার্বভৌমত্বের (Monists) সমর্থক। বোঁদা ও হব্‌স এই তত্ত্বের প্রবক্তা এবং অস্টিন মুখ্য প্রচারক। জাঁ বোঁদা (১৫৭৬) বলেন, "নাগরিক ও প্রজার ওপর আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত চরম ক্ষমতাই হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতা।"

Dhaka University Institutional Repository

আইনগত সার্বভৌমত্বের ধারণাটি প্রদান করেন জন অস্টিন। জন অস্টিন (১৮৩২) বলেন, "যদি কোন উর্দ্ধতন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি অনুরূপ কোন উর্ধ্বতন ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে এবং সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করে, তবে উক্ত সমাজে ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সার্বভৌম এবং উক্ত সমাজ (উর্দ্ধতন ব্যক্তিসহ) রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।"

অধ্যাপক গার্নারের (১৯৫৫) মতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত আধুনিক ধারণার উদ্ভব ঘটে। সার্বভৌমত্বের ধারণাটি তাই আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোকার এজন্যই বলেছেন যে, 'রাষ্ট্রের আইনসঙ্গত সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত তত্ত্বটি সুস্পষ্টভাবে আধুনিক।' আধুনিক সার্বভৌমত্বের ধারণায় সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সংঘ, প্রতিষ্ঠান, দলের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে স্বীকার করা হয়। এই ধরনের সার্বভৌমত্বের সমথর্করা একে সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদী তত্ত্ব নামে অভিহিত করেছেন। রাষ্ট্রের ইচ্ছা অসীম এই ধারণা বাতিল করে দেয়ার পর লাস্কি বলেন যে, মানুষের আনুগত্য বহুমুখী। রাষ্ট্রের ইচ্ছা ব্যক্তির ইচ্ছা দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া চাই। কারণ রাষ্ট্রের ইচ্ছা কখনও একতরফা হতে পারে না। ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্র। অতএব ব্যক্তি তার নিজের অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করে গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেবে। রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে সীমায়িত করার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র অধিকার। যে রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য একটি স্পষ্ট ও প্রগতিমূলক অধিকার ব্যবস্থা ঘোষণা করে এবং তাকে কার্যকর করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়, সে রাষ্ট্রের কাজ বা ক্ষমতা কখনও সীমাহীন হতে পারে না। একইভাবে জন লকের সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে গড়ে উঠা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ জনগণের জীবন, সম্পত্তি ও নিরাপত্তার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হতে বাধ্য হয়। যদি সার্বভৌম শক্তি নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হয় তবে সার্বভৌম শক্তি পরিবর্তন করার অধিকার জনগণের হাতে থাকে। সার্বভৌমের প্রকৃতি তাই রুশোর সাধারণ ইচ্ছার মতো সকলের সম্মিলিত ইচ্ছার সমন্বয়ে যথার্থ বলে প্রতীয়মান।

বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র নিজের চরম সার্বভৌমিকতাকে অটুট রাখতে সতর্ক হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধ্যবাধকতাকে গ্রহণ করে। চরম সার্বভৌমিকতার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে তা আপোষহীন অথচ অপ্রতিহত প্রতাপ বা ক্ষমতা ভোগ করে না, অর্থ্যাৎ আন্তর্জাতিক প্রভাবকে অগ্রাহ্য করতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩.১ সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি

জাতীয় রাষ্ট্রের হাতেই থাকবে সার্বভৌম শক্তি, যে শক্তিকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না। এরূপ একত্ববাদীদের অন্যতম জন অস্টিন যিনি আইনের প্রয়োগের কথা বলে সার্বভৌমকে আরো কর্তৃত্ববাদীভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের যুক্তি হলো সার্বভৌমত্বের একত্ববাদ রাষ্ট্রকে অভ্যন্তরীণ কলহ থেকে মুক্তি দিতে পারবে।

আজও রাষ্ট্রের ক্ষমতা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা ভাবনার প্রকাশ ঘটছে। বার্কার সার্বভৌমিকতার ধারণাটিকে শুধুমাত্র আইনগত ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সমাজের প্রেক্ষাপটে বিচার করেছেন। জাতীয় সমাজ যে চিন্তা প্রণালীকে সামনে রেখে কাজ করে তা অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে জনমতের সৃষ্টি হয়। আইন প্রণয়নকারী সংস্থার সঙ্গে জনমতের এ সম্পর্ক বিচার করেই সার্বভৌমিকতার দুটি রূপকে চিহ্নিত করেন। রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা ও অপরটি আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা। বার্কার মনে করেন, বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি কেন্দ্র অবশ্যই থাকা দরকার। এই চূড়ান্ত মীমাংসাকারী কেন্দ্রটি হলো 'সার্বভৌম' সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপ, শেষ কথাটি বলার কর্তৃপক্ষ।

২.৪ রাষ্ট্রের ধারণা

রাষ্ট্র একদিকে যেমন ভৌগলিক, তেমনি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সংকীর্ণ অর্থে 'রাষ্ট্র' শব্দটি দ্বারা 'জাতি', 'সমাজ', 'সরকার' প্রভৃতি বোঝানো হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের সভ্য হিসেবে নাগরিক জীবন পালিত হয় ও মৃত্যুবরণ করে। এজন্যই এরিস্টটল বলেছেন যে, 'মানুষ জন্মগত বা স্বভাবগত কারণেই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব'।

সমাজ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে 'রাষ্ট্র' শব্দটি দ্বারা নির্দিষ্টভাবে রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য চিত্রিত হয়নি। সভ্যতার বিকাশে মানুষ যত রকম সংঘ গঠন করেছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ এবং শক্তিশালী সংঘ হচ্ছে রাষ্ট্র। মানবিক সংগঠনের মধ্যেও রাষ্ট্র সর্বোচ্চ সংগঠন। আধুনিক রাষ্ট্র দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম মেকিয়াভেলী সর্বপ্রথম তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে 'রাষ্ট্র' কথাটি উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রের সংজ্ঞায়নে দার্শনিকদের পরস্পর

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধীতা দেখা যায়। বিভিন্ন ব্যক্তি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। Smith বলেন, ভাববাদী দার্শনিকরা রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন। আধুনিক উদারনীতিবাদীরা রাষ্ট্রকে জনকল্যাণ সাধনকারী একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করলেও মার্কসবাদীরা এরূপ রাষ্ট্রকে বুর্জোয়া রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করেন। মার্কসবাদীরা বলেন, রাষ্ট্র হলো শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীশাসনের একটি হাতিয়ার। পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত নামে এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। আবার অনেক রাষ্ট্র দার্শনিক মনে করেন, রাষ্ট্র আসলে কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি নয়, সমগ্র লোকসমাজের প্রতিনিধি। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল থেকে শুরু করে আধুনিককালের বিভিন্ন লেখক-চিন্তাবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের সংজ্ঞায়ন করেছেন।

ম্যাকাইভার বলেন, "রাষ্ট্র হলো একটি সংঘ, যা বল প্রয়োগের অধিকারী, সরকার কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডে অবস্থিত সমাজের সামাজিক শৃঙ্খলার বাহ্যিক ও সর্বজনীন অবস্থা বজায় রাখে।" অর্থাৎ রাষ্ট্র নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদানে ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সর্বজনীন কর্তৃত্ব প্রয়োগের স্বীকৃত সংগঠন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য সরকার আইন প্রয়োগ করে। এরূপ একটি সরকার যা বহি:শক্তির শাসন হতে সেই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখে।

অধ্যাপক গার্নার বলেন, 'রাষ্ট্র হচ্ছে এমন এক জনসমাজ, যা সংখ্যায় অল্পাধিক বা বিপুল কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যা বহি:শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন এবং যার একটি সংগঠিত সরকার রয়েছে, যার প্রতি অধিকাংশ অধিবাসী স্বাভাবিকভাবে অনুগত।' তিনি সরকারের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আনুগত্যের পাশাপাশি সুসংগঠিত সরকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

যাইহোক রাষ্ট্রের সংজ্ঞায়নে বলা যায় যে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত একটি সমিতিকে রাষ্ট্র বলা হয়। সমিতি সম্প্রসারিত হয়েছে তেমনি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যও ব্যাপকতা পেয়েছে। সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল নাগরিক চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান রাষ্ট্রগুলো কল্যাণমুখী কাজে নিবেদিত। জাতিসত্ত্বার শাসন কাঠামোতে সরকারের দক্ষতার উপর সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি নির্ভর করে। নির্দিষ্ট সীমানার অভ্যন্তরে

Dhaka University Institutional Repository

সুশাসনের ঘাটতি দেখা দিলে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রকে জবাবদিহি করতে হয়। রাষ্ট্রের আধুনিকতায় তাই বহুমুখী প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।

২.৫ রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্ব

রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সার্বভৌমিকতা। অধ্যাপক গেটেল সার্বভৌমিকতার ধারণাকে 'আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি' বলে বর্ণনা করেছেন।

একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতা সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির ওপরে নির্ভর করে। অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ আইন প্রণয়নকারী চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষকে আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়। আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের আদর্শেই চূড়ান্ত। আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হলো রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যতদিন বিদ্যমান থাকে ততদিন সার্বভৌম স্থায়ী হয়। রাষ্ট্রের সরকার পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয় না। এজন্যই বলা হয়, সার্বভৌম ক্ষমতা হচ্ছে রাষ্ট্রের চিরন্তন ও চিরস্থায়ী ক্ষমতা। এই ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং বাধ্যতামূলকভাবে নাগরিকদের নিকট থেকে আনুগত্য লাভ করে থাকে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা অসীম। ব্যক্তি, সংঘ প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অবাধ, চরম ও চূড়ান্ত। কিন্তু বহিস্থ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমের প্রয়োগ অবাধ ও অসীম নয়।

বিশ্বায়ন যেহেতু রাষ্ট্রের সীমানাকে চ্যালেঞ্জ করেছে, তাই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সাথে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ ছাড়া জাতিরাষ্ট্রের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখা করা সম্ভব নয়। বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক নীতিমালার ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রীয় বাধা-নিষেধ সংকুচিত হয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বায়ন কীভাবে রাষ্ট্রের সামর্থ্য এবং ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে সেই বিশ্লেষণ প্রয়োজন। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব এবং প্রক্রিয়া নিয়ে নানা মতামত রয়েছে। একদিকে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, 'জাতি রাষ্ট্রের' ধারণা এখন একটি ভবিষ্যতহীন এবং সেকেলে বিষয়। 'বর্তমান অবস্থা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের বিদ্যমান ধরনকেই চ্যালেঞ্জ করছে না বরং রাষ্ট্রীয় সীমানা অক্ষুণ্ন রাখার সম্ভাবনা, সার্বভৌম ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে (Opello Ges Rosow, 1999)। অন্যদিকে বাকিরা মনে করেন, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা কর্তৃত্বের অবিরাম এবং

Dhaka University Institutional Repository

অনিয়মিত প্রভাব সত্ত্বেও রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে তার সক্রিয় অবস্থানেই আছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত বেশকিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্তৃত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা জাতীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তি দুর্বল করে দিচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় পরিসরে জাতীয় নীতিনির্ধারকদের স্বাধীনভাবে এবং কার্যকরিভাবে ভূমিকা পালনের সামর্থ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। বিশ্বায়নের অন্যতম একটি দীর্ঘ সময়ব্যাপী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে- বিস্তৃত আন্ত:সরকারীয় এবং বিরাষ্ট্রীয় কার্যকর্তার প্রাধান্য বৃদ্ধি, যেগুলো একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পরিচালনার প্রেক্ষিতে আবির্ভূত হয়েছে; যা সাধারণভাবে ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষে সংগঠিত করা সম্পূর্ণভাবে সামর্থের বাইরে।

কেনিচি ওহমেন (২০০০) এর ভাষায় 'রাষ্ট্রের অধীনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার দিন শেষ হয়ে গেছে। জাতি-রাষ্ট্র এখন অতি দ্রুততার সঙ্গে তার প্রকৃতিগত সত্তা হারাচ্ছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, তিনি যুক্তি দেখান, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সত্যিকার অর্থেই এক বিশ্ব অর্থনীতির জন্ম দিয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানী ও পুঁজিবাজার এ বৈশ্বিক অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। রাজনৈতিক সীমা-পরিসীমার ধারণা ও অস্তিত্ব আজ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। এমনকি এটাও দাবি করা হচ্ছে- জাতীয় পর্যায়ে নীতি গ্রহণের বিষয়টি এখন সেকেলে ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে; কেননা জাতীয় অর্থনীতি এখন বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে (ভূঁইয়া ও রহমান, ২০১০)। Reinicke 'অভ্যন্তরীণ' এবং 'বহিস্থ' সার্বভৌমত্বের অবস্থানকে তুলে ধরেন। তিনি এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, বিশ্বায়ন যদিও বহিস্থ সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে আপোস করেছে, কিন্তু দেশীয় অর্থনৈতিক কাঠামোগত পুন:বিন্যাস এবং কর্পোরেট সংস্থা এবং আর্থিক ক্ষমতার নতুন নেটওয়ার্ক অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের প্রয়োগকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ করছে।

নিশ্চিতভাবে বলা যায় পরিবর্তিত অবস্থা এবং ক্ষমতার নতুন কাঠামোগত বিন্যাস একটি বিস্তীর্ণ প্রক্রিয়ার অংশ, যেখানে কর্তৃত্ব শুধুমাত্র রাষ্ট্রের এবং সার্বভৌমত্বের বিষয়টি সম্পত্তি না হয়ে বরঞ্চ রাষ্ট্রীয় এবং বিরাষ্ট্রীয় কার্যকর্তাদের মধ্যে পুন:বণ্টিত হচ্ছে। কিন্তু সার্বভৌমত্ব এমন একটি অবিভাজ্য প্রত্যয়, যে এটা শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন ইস্যু এবং ক্ষেত্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় কর্তৃত্ব অর্জন করার সামর্থ্যকে বোঝায়। বিশ্বায়নের বিস্তারে বিভিন্ন ইস্যুতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের চর্চার ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের বিভিন্নতা দেখা যায়। যেহেতু বিশ্বায়ন বিশ্বের আর্থিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশসহ বহু ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণের একিভূত ব্যবস্থার সমর্থক। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ এ সকল বিষয়ে আপোসকামী সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ প্রায়শই নিজ স্বার্থ ও

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। জাতিরাষ্ট্রগুলোর সামর্থ্যের ভিন্নতা এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভিন্ন ভিন্ন ফলাফলের অধিকারী। সুতরাং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় জাতিরাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ সামর্থ্যভেদে সার্বভৌমত্বের অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এখন আমি নয়াউদারতাবাদের আলোকে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাখাতের অবস্থা পর্যালোচনা করবো।

২.৬ বাংলাদেশের শিক্ষাখাত

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা মূলত দেশীয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতির সম্মিলিত ফল। হাজার বছরের আর্য বা হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থা, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা এবং সর্বশেষ মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার সংমিশ্রণ, সাথে রয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তিন ধরনের স্তর দেখা যায়। যথা : ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা, খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং গ) উচ্চ শিক্ষা। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষানীতির মধ্যে কুদরত-ই খুদা কমিশন (১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ), শামসুল হক শিক্ষা কমিশন (১৯৯৭ খৃষ্টাব্দ), জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩ (মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন), জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ (কবির চৌধুরী শিক্ষা কমিশন) প্রভৃতি। ২০০৩ সালে 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ' মন্ত্রণালয় পরিবর্তিত হয়ে 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়'-এ পরিণত করা হয়। এই মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন সরকারের সচিব। সচিবকে সহায়তা করার জন্য ২ জন যুগ্ম সচিব, ৪ জন উপ-সচিব, ১ জন উপ-প্রধান, ৯ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ১ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান, ২ জন সহকারী প্রধান, ১ জন পরিসংখ্যান কর্মকর্তা এবং ৫৬ জন কর্মচারী নিয়োজিত থাকেন। প্রাথমিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান করাই এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব।

বর্তমানে বাংলাদেশে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৫বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, পূর্বে সরকারিভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলেও বর্তমানে ৭ ডিসেম্বর, ২০১০ সালে জাতীয় সংসদে পাসকৃত 'জাতীয় শিক্ষানীতি'-এ ৫ বছর বয়স থেকে ১ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। তবে, দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বিভিন্ন কিন্ডার গার্টেনে পূর্ব থেকেই এ ধরনের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। এখানে মূলত শিশুদেরকে খেলাধুলা

Dhaka University Institutional Repository

ও আনন্দের মাধ্যমে বর্ণমালা, সংখ্যা, ছড়া প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয় (নবী, ২০১৪) । এই পদ্ধতিটি বেশ আগে থেকেই বেসরকারিভাবে পরিচালিত কিছু বিদ্যালয়ে বিশেষত এনজিও পরিচালিত যেমন, সুরভী, ওয়ার্ল্ড ভিসন পরিচালিত অপরাজেয় বাংলা জাগো ফাউন্ডেশনের বিদ্যালয়গুলোতে ছিল। সরকার এই নতুন ব্যবস্থাটি এ সমস্ত বিদ্যালয়ের অনুকরণে গ্রহণ করেছে।

বাংলপিডিয়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১২ সালে ১৩ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রকাশ করে। এর মধ্যে ৯ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক এবং ৪ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পাঠদান করে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেমন ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করা হয় তেমনি শিশুরাও ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা মাধ্যমে গড়ে উঠছে। প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ির এই ভিন্নতা দেশের ভবিষৎ প্রজন্মকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ে পৃথক করে। বাংলাদেশ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুসারে বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়া করছে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৯৭৩ জন। এর মধ্যে ছেলে শিক্ষার্থী ৯৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৯৫৩ জন এবং মেয়ে শিক্ষার্থী ৯৮ লক্ষ ৮ হাজার ২০ জন। মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় ২৩ হাজার ৬৭ জন বেশি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে ২০১২ সালে এনজিও বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পে মোট শিশুর ১.৬ শতাংশ লেখাপড়া করছে। বাংলাদেশের ড্রপ আউটের হার ২০১৩ সালে ৭১.৭০ শতাংশ। যদিও অন্যান্য সূত্রে এই হার ৪০ শতাংশ পাওয়া গেছে। তবে, রাশেদা কে. চৌধুরী তার লেখায় (প্রথম আলো ৮.১১.১৪) এই হার ২০ শতাংশ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন, এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই হার গড়ে ৩০ শতাংশ।

স্কুলে ভর্তি বৃদ্ধির মাধ্যেমে নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যাপক অগ্রগতি হলেও শিক্ষার গুণগত মানে হতাশাজনক অবস্থায় রয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংকসহ একাধিক গবেষণায় তার প্রমাণও মিলেছে। সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অব মালয়ের অধ্যাপক নিয়াজ আসাদুল্লাহ পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, মাধ্যমিক পাশ করার পরও শিক্ষার্থিদের জ্ঞান প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে নিচে। শিক্ষার মান যাচাইয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ পাওয়া শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হতে পারছে না (টিপু, ২০১২)। শিক্ষার নিম্ন

Dhaka University Institutional Repository

মানের কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটছে বলে অনেকে মনে করেন। শিক্ষার বর্তমান অবস্থা বজায় থাকলে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা গেলেও তা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নজর দিতে গিয়ে সরকার কিছু সূচকের উন্নতি ঘটিয়েছে। কিন্তু বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গ্রেডিং পদ্ধতি, সৃজনশীল প্রশ্ন এবং ৫ম শ্রেণি সমাপনী, ৮ম শ্রেণি সমাপনীসহ আরো দুটো পাবলিক পরীক্ষা শিশুদের শিক্ষা অর্জনে পরীক্ষা প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করে। এ+ অথবা গোল্ডেন ৫ শিশুদের মধ্যে একটি ব্র্যান্ড ফলাফলের জন্য প্রতিযোগী মনোভাব বৃদ্ধি করে। সারা বছর মাসের নির্দিষ্ট পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষা প্রস্তুতিতে শিক্ষার্থী শুধু বেশি নম্বর প্রত্যাশায় লেখাপড়ার সহজ সমাধান স্বরূপ বাজারের গাইড বই ও টিউশনি নির্ভর হয়ে পড়ে। মূল পাঠ্য বইয়ের বাইরে এ সকল নির্ভরতা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সহজেই আকৃষ্ট করে।

২.৭ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান

১৯৪৪ সাল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন সমাপ্তির পথে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি শহর ব্রেটন উডস-এ অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা গঠন, যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সাধন এবং বাণিজ্য ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উক্ত বিষয়গুলোর প্রয়োগকল্পে সঠিক কাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা হয়।

এগুলো নিম্নরূপ:

১) বিশ্ব ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development বা IBRD)। যার মুখ্য ভূমিকা হবে যুদ্ধোত্তর বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (World Economic Order) পুনর্গঠন এবং উন্নয়নসাধন নিশ্চিত করা।

২) আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund বা IMF), যার মুখ্য ভূমিকা হবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। এবং

৩) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (International Trade Organization বা ITO), যার প্রধান কাজ হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমস্যাসমূহ পর্যবেক্ষণ ও সমাধানের উপায় বের করা।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা, পর্যালোচনা, বাণিজ্য বিরোধ নিস্পত্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসহ অন্য কোন বিধি বিধান তৈরি ও মেনে চলার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলোর মডেলে গ্যাট গড়ে উঠেছিল এবং উন্নত বিশ্বের ফোরাম হিসাবে কাজ করে আসছিল। গ্যাট (General Agreement of Trade and Tariff) উন্নত দেশসমূহের অনুকূলে এ কথা উল্লেখ করে, উন্নয়নশীল দেশসমূহ তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (ITO) প্রতিষ্ঠা করতে দাবি করে। এ প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ ১৯৬৩ সালে ITO গঠনে একটি পর্ষদ গঠন করে। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেস অনবরত এ ব্যাপারে ভেটো প্রয়োগ করেছে। ১৯৪৭ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ১৯৮৬ পর্যন্ত সাত দফা আলোচনার মাধ্যমে গ্যাট পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে। ১৯৪৭ হতে ১৯৬২ পর্যন্ত গ্যাটের পাঁচটি রাউন্ড সম্পন্ন হয়- জেনেভা, এনেসি, টরকোয়ে, জেনেভা ও দিলন রাউন্ড। যা ছিল মূলত শুল্ক অবাধকরণ সম্পর্কিত। কিন্তু পরবর্তী রাউন্ডসমূহে আরও অনেক বেশি সংখ্যক দেশ, পণ্য এবং বিষয়েরও আলোচনা হয়। ১৯৮২ সালে উরুগুয়েতে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের মাঝ দিয়ে উরুগুয়ে রাউন্ডের বীজ বপন করা হয়। এই বৈঠকে ঐক্যমত হয় যে, বিশ্ববাণিজ্য অবাধকরণকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কয়েক বছর পূর্ব প্রস্তুতি এবং আলোচনার পর অবশেষে এই রাউন্ডের যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৬ সালে। ক্রমশই অধিকসংখ্যক দেশ ডিসেম্বর মাসে উরুগুয়ে রাউন্ডের ফলাফল সম্বলিত 'ড্রাফট ফাইনাল এ্যাক্ট' (DFA) শীর্ষক প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠার খসড়া দলিলে গ্যাটের সাবেক মহাপরিচালক আর্থার ডাংকেল সদস্য দেশসমূহের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন। চূড়ান্ত দলিল ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৩ তারিখে প্রণয়ন করা হয়। এই দলিলে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তি হয়েছে- সেগুলো হল: কৃষি, স্যানিটেশন, বস্ত্র ও পোশাক, সার্ভিসেস, বিনিয়োগ, ডাম্পিং প্রতিরোধ, কাস্টমস্ ভেলুয়েশন, উৎপাদন সূত্রের বিধিমালা, ভর্তুকি, ধীসম্পদ সংক্রান্ত অধিকার, বিবাদ নিস্পত্তি, বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা, সরকারি ক্রয় ইত্যাদি। বিভিন্ন চুক্তিতে যে শর্ত রয়েছে, প্রত্যেক সদস্য দেশকে তা মেনে চলতে হবে। ফলে উরুগুয়ে রাউন্ডের সমাপ্তির পর গ্যাট রূপান্তরিত হয়ে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় পরিণত হয়। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে ১২৪টি দেশ এই সংস্থার দলিলে স্বাক্ষর করে।

জাতীয় সীমানার বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সমন্বয় করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সরবরাহ করা ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বায়নের বিস্তৃতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন:

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদি। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার উন্নত বিশ্বের দেশগুলো। নীতিমালা প্রণয়নে এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়।

২.৮ নয়া উদারবাদী নীতি ও প্রাথমিক শিক্ষাখাত

বিশ্বায়নের বিস্তারে বাংলাদেশ বিগত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য কিছু সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন, কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি, ওয়াশিংটন ঐক্যমত, পিআরএসপি, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, শিক্ষা ক্ষেত্রে পিইডিপি-১; পিইডিপি-২ ও পিইডিপি-৩ অন্যতম। দাতাগোষ্ঠীদের পরামর্শে এ কর্মসূচিগুলোর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

২.৮.১ শিক্ষার পণ্যায়ন

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ বছর মেয়াদি চার ধাপের একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। যার আলোকে দেশের উচ্চ শিক্ষা ক্রমান্বয়ে বেসরকারিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। দেখা গেছে ইউজিসির দেওয়া কৌশলপত্র মূলত বিশ্বব্যাংকের করা কৌশলপত্রের কপিপেস্ট। এই প্রকল্পে ইউজিসি শুধু বিশ্বব্যাংকের ঋণই নেয়নি, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারি ভর্তুকি তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছে মঞ্জুরি কমিশন। ভর্তুকি তুলে নেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হবে। এ খাতগুলো কৌশলপত্রে নির্ধারিত করা হয়। প্রথমত, বেতন ফি বৃদ্ধি পরামর্শ। ২০০৬ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত মোট তিন ধাপে পর্যায়ক্রমে বেতন ফি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বেতন ফি বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশি-বিদেশি ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে কৌশলপত্রে। শিক্ষার্থীদের ঋণ নিয়ে উচ্চ শিক্ষায় সমাপ্ত করার উপর জোর দিয়েছেন কৌশলপত্রের নির্মাতারা। সেক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীকে কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে ব্যাংক থেকে মোটা অংকের ঋণ করতে হবে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেছেন একজন শিক্ষার্থীকে ব্যাংক ঋণের ভার তার শিক্ষাজীবন শেষেও বয়ে বেড়াতে হবে (তুহিন, ২০১২)। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি কমিয়ে নেওয়ার যে কথা ইউজিসি'র

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তা বাংলাদেশের সংবিধান বর্ণিত শিক্ষা অধিকার পরিপন্থী। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন ও আবাসিক সুবিধা নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য সহায়ক। কিন্তু বৈদেশিক পরামর্শে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বেতন বেড়ে গেলে অনেক পরিবারের পক্ষে তা যোগান দেওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত সমস্ত ছাত্রসমাজের ভবিষ্যত নির্ধারণ করে। শিক্ষার উন্নয়নে নাগরিক চাহিদাকে রাষ্ট্র স্বয়ং পর্যালোচনা করবে। স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের মতামত ও সামর্থ্য বিবেচনা না করেই এ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে সরকারকে প্রায়শই অস্থিতিশীল অবস্থা মোকাবিলা করতে হয়।

২.৮.২ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার

১৯৮০-এর দশকের ঋণ সঙ্কটেরকালে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের ঋণ পাওয়ার যোগ্য হওয়ার জন্য অনেকগুলো উন্নয়নশীল দেশ স্থিতিশীলকরণ ও কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি নামক পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করে। এসব কর্মসূচী ছিল উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাজার উদারীকরণের শর্তাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণীত। ১৯৯০ দশকের প্রথম ভাগেই আবার ব্যাপকভাবে ঋণ-ভারাক্রান্ত ও ঘাটতির সমস্যা-পীড়িত অধিকাংশ দক্ষিণ এশীয় দেশে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের নানা কর্মসূচির মধ্যে প্রবেশ করে এবং বিশ্ব বাণিজ্যিক ব্যবস্থার জন্য তাদের অর্থনীতিগুলিকে উন্মুক্ত করে দেয়।

তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিয়ে বিশ্বব্যাংকের মনোযোগের সূত্রপাত গত শতাব্দীর '৮০-এর দশকে। '৭০-এর দশকে দারিদ্র্য বিষয়ক অনেক গবেষণা, গ্রাম বিষয়ক অনেক পরিকল্পনা সমীক্ষা হতে থাকে। গ্রাম উন্নয়নই হয়ে দাঁড়ায় তখনকার প্রশাসন আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল স্লোগান। এ সময় এনজিও প্রতিষ্ঠার শুরু এবং বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত 'সেফটি নেট' কর্মসূচি হয়ে দাঁড়ায় উন্নয়নকে সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে। '৭০-এর দশকে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এসব কর্মসূচীকে 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন'-এর চিন্তা কাঠামো অন্তর্ভূক্ত হয়। এই কর্মসূচীর নাম দেওয়া হয় কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি (স্ট্রাকচারাল এ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম)। কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি বিভিন্ন শর্ত প্রদানপূর্বক ঋণ উপস্থিত করে। এ শর্তগুলো ছিলঃ ১) বিরাষ্ট্রীয়করণ; ২) আমদানি ও রপ্তানির শুল্ক-অশুল্ক সকল বাধা বা

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রণ দূর করা; ৩) মুদ্রার অবমূল্যায়ন; ৪) শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল ক্ষেত্রকে অধিক থেকে অধিকতর হারে বাজারমুখী করা; ৫) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হ্রাস; ৬) বহুজাতিক সংস্থার বিনিয়োগ লাভজনক করার জন্য নানা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; ৭) খনিজ সম্পদসহ সাধারণ সম্পত্তি ব্যক্তিমালিকানায় বিশেষভাবে বহুজাতিক সংস্থার কর্তৃত্বে নিয়ে আসা; এবং ৮) গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদির মতো পরিসেবা, যা প্রায় সবদেশে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যোগান দেওয়া হতো সেগুলোর দাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা। উপরোক্ত কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন ক্রমাগত বেসরকারীকরণকে ত্বরান্বিত করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ, সকল ক্ষেত্রকে অধিক বাজারমুখী ও সেবাখাতে বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার কারণে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবায় ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ও টেলি যোগাযোগের মতো খাতে নাগরিককে অধিক অর্থ ব্যায় করতে হয়।

কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি ও পরবর্তী সময়ের ওয়াশিংটন ঐক্যমত, পিআরএসপি এর শর্তগুলো বাংলাদেশের উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। সর্বশেষ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আটটি লক্ষ্য বাস্তবায়নে কার্যক্রম চালু আছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা উন্নয়ন সাহায্যের নামে বিভিন্ন শর্ত বাংলাদেশের শিক্ষা থেকে শুরু করে বাজার, পরিসেবা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদ সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতাকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

২.৮.৩ দারিদ্র্য বিমোচনে পরনির্ভরশীলতা তৈরি

অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল মোকাদ্দেম আকাশ বলেন, দারিদ্র্যের দু'ধরনের সংজ্ঞা। একটি আপেক্ষিক, অপরটি চরম। আদিমকালে দারিদ্র্যের একরূপ ছিল। আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার দেশগুলোতে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন। এটি নির্ভর করে যিনি দারিদ্র্যকে সংজ্ঞায়ন করছেন তার মূল্যবোধের উপর। পিআরএসপিতে ১ ডলারের নীচে এবং ২ ডলার আয়ের নীচে যারা আয় করে তাদের দারিদ্র্য বলা হয়। তিনি বলেন, "এই মানদণ্ড ঠিক নয়। সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা জনগণের অধিকারে আছে কি না সেটি দেখতে হবে। তিনি মনে করেন, গড় আয়ের এক-তৃতীয়াংশের নিচে যাদের আয় তারাই দারিদ্র্য" (সাক্ষাৎকার, মাহবুবুল মোকাদ্দেশ আকাশ, ১৯ জুন ২০১৪)। দারিদ্র্য বিমোচনে নির্ভরতা তৈরির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্বায়ন বাণিজ্যকে ঠিকমত পরিচালনার জন্য বাজার ও

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত খাতের সংস্কারের জন্য রাষ্ট্রকে চাপ দেয়। নব্য উদারতাবাদের এই বৈশিষ্ট্য কাঠামোগত অভ্যন্তরীণ বৈষম্য নিয়ে কথা বলে না। বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত সুশাসনের নির্ধারকগুলো অনুরূপ কাঠামোকে নির্দেশ করে। ফলে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বাজার প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পায়। কুশাসন বজায় রেখে সুশাসন করা যায় না। মুক্তবাজার পদ্ধতি এই ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। সার্বভৌম বলতে অর্থনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক স্বনির্ভরতা থাকতে হবে। স্বনির্ভর না হওয়া পর্যন্ত উন্নয়নকে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী ত্বরানিত করতে হবে। এটি ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনে নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাবে।

২.৮.৪ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগিরাও প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্নভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় গৃহীত তিনটি কর্মসূচিতে অর্থায়নসহ বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা, ডিএফআইডি, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ আরো অনেকে। পিছিয়ে পড়া ও আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার কথা দাতাগোষ্ঠীরা বলেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের (এমডিজি) সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আটটি ক্ষেত্রের উন্নয়নকে বাস্তবায়ন করতে সরকারকে সহযোগিতা করছে উন্নয়ন সহযোগিরা। এই আটটি লক্ষ্যের অন্যতম প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিসহ পাঠ্যসূচী, পঠন পদ্ধতি এবং পরীক্ষা পদ্ধতিতেও বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গ্রেডিং পদ্ধতি প্রণয়ন, ২০০৯ সাল থেকে প্রাথমিক ও অষ্টম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, সাব ক্লাস্টার পদ্ধতিসহ সর্বশেষ পাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন প্রাথমিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করে।

উপসংহার

মুনাফার দ্বারা পরিরচালিত প্রতিযোগীতামূলক রাষ্ট্র শিক্ষার মত একটি গণপণ্যকে নিছক পণ্য পরিণত করতে ব্যস্ত। ফলে রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াবে। বাজার সে জায়গা দখল করবে। আর এভাবেই শিক্ষার মূল্য বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষাও হয়ে পড়বে সামাজিক বৈষম্যের আরেক

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিচ্ছবি। শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও তা শিক্ষার গুণগত মানকে নির্দেশ করে না।

বিশ্বায়নের ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সমগ্র বিশ্বকে একটি ছাতার নিচে আসার জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করে। দারিদ্র্য বিমোচন, বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা, সাংস্কৃতিক লেনদেন, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি সমস্ত কিছুর তদারকি ও নীতিমালা তৈরী হয় এ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। অনেকেই বিশ্বায়নের পক্ষে মতামত প্রদান করেন। আবার নেতিবাচক দৃষ্টিতে বিশ্বায়নের বিপরীতে অনেকের অবস্থান। এই দু'টি মতাদর্শের বাইরে রূপান্তরবাদী তাত্ত্বিকরা বিশ্বায়নকে দেখেন ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ের মিথস্ক্রিয়া স্বরূপ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা পরবর্তীতে অর্থনীতি ও শাসন সংক্রান্ত সংস্কারের ধারণা নিয়ে বিশ্বায়নের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি, ওয়াশিংটন-ঐক্যমত ও পিআরএসপি এ সবের মধ্যে অন্যতম।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ঃ বর্তমান অবস্থার একটি বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

একটি দেশের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রধান ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের পেছনে রয়েছে শক্তিশালী প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা। বিশ্ব ব্যাংকের মতে এই আটটি দেশ শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির কারণে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্ময়কর উন্নতির পেছনে শিক্ষার এই ব্যাপক অবদানের কারণে উপরোক্ত আটটি দেশকে বিশ্বব্যাংক High Performing Asian Economics (HPAE) বলে আখ্যায়িত করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম পর্যায় প্রাথমিক শিক্ষা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষা (সরকারি ও বেসরকারি) এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষাসহ ইংরেজি মাধ্যমের কার্যক্রমকেও চিহ্নিত করে। এই অধ্যায়ে আমি বাংলাদেশের বিদ্যমান প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উপর একটি বিশ্লেষণ করবো।

৩.১ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ও ধারাবাহিক উন্নয়ন

বিশ্বব্যাংকের মতে, বাংলাদেশে কেন্দ্রীভূত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। এটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ কেন্দ্রীভূত শিক্ষাব্যবস্থা। ১৯৭১ সালের পূর্বে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতো কমিউনিটি, সরকার আংশিক ব্যয় বহন করতো। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে জাতীয়করণ করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সরকার ১৯৮১ সালে স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন করে। ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯২ সালে ৬৮টি থানাকে এবং ১৯৯৩ সাল থেকে দেশের সকল থানাকে এ আইনের আওতাধীন আনা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার ১৯৯২ সালে মন্ত্রণালয় স্তরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগণের ন্যূনতম শিক্ষার চাহিদা পূরণের অঙ্গীকার নিয়ে সরকার ২রা জুন, ২০০৩ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংবিধানে নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা একটি মৌলিক নীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়ানে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক সম্মেলনকে সামনে রেখে গৃহীত আগাম একটি পদক্ষেপ হিসাবে জাতীয় সংসদে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (Compulsory Primary Education) আইন পাস হয় ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সালে। এ যুগান্তকারী আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো ৬-১০ বছর বয়সী সকল শিশুকে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের আওতায় অভিভাবকরা তাদের ৬-১০ বছরের সন্তানকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাবে এবং ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক এ দু'ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে :

- বাংলাদেশে দশ ধরনের আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা রয়েছে :
  - বার্ষিক বিদ্যালয় জরিপ (ASC) থেকে মূলত আট ধরনের বিদ্যালয়ের তথ্য পাওয়া যায়।
  - বাকী দু'ধরনের বিদ্যালয়ের তথ্য পাওয়া যায় মূলত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত জরিপ ও বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এন্ড স্ট্যাটিসটিক্স (BANBEIS) থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয়	শিক্ষক (পুরুষ)	শিক্ষক (মহিলা)	বিদ্যালয় সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী	শিক্ষার্থী (বালিকা)	বালিকা শিক্ষার্থীর শতকরা হার (%)
বার্ষিক বিদ্যালয় জরিপ থেকে						
১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (GPS)	৩৭,৬৭২	২১৩,৬৫২	১২৪,১৯৩	৯,৯০৪,২৫৪	৫,০৭১,২৫২	৫১.২%
২. রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (RNGPS)	২০,০৬১	৭৩,৬৭৬	২৫,৭০৮	৩,৬৫০,৬২৪	১,৮৪০,৩৬৮	৫০.৪%
৩. পরীক্ষণ (Experimental) বিদ্যালয়	৫৫	২৮০	১৮৩	৯,০৮০	৪,৫৫৬	৫০.২%
৪. কমিউনিটি বিদ্যালয়	৩,১৬৯	১০,০০৬	৭,৫৩৫	৪৬২,৯৯৫	২৩৩,৬৮৮	৫০.৫%
৫. নন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (NRNGPS)	৬৬৬	২,৭৩০	১,৮৫৩	১০৫,৪৩৪	৫২,২৬২	৪৯.৬%
৬. কিন্ডার গার্ডেন	৪,৪১৮	৪১,১২৯	২৪,২৫১	৫৩৫,১২৭	২৩৬,৪৬৬	৪৪.২%
৭. এনজিও বিদ্যালয়	৩৬১	১,৩৩৪	৯৩৫	৪২,৫০৭	২১,৩৪৪	৫০.২%
৮. মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক শাখা	৮৫৮	১১,২২৬	৫,১৯৩	২৮৫,৪৩৪	১৪৬,৬৪২	৫২.৪%
মাদ্রাসা BANBEIS থেকে (PPEIS)						
৯. এবতেদায়ী মাদ্রাসা	২,৩০৫	৮,৪০৫	১,০১১	২৪৩,২১১	১২৬,৩৬১	৫২.০%
১০. দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসায় সংযুক্ত প্রাথমিক শাখা	৯,১২০	৩২,৮৪৩	৩,৬৭৬	১,৭১৯,২২৮	৮৩০,১৯৪	৪৮.৩%
মোট	৭৮,৬৮৫	৩৯৫,২৮১	১৯৪,৫৩৮	১৬,৯৫৭,৮৯৪	৮,৫৬৩,১৩৩	৫০.৫%

সূত্র : DPE (2011a)

সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প (১৯৯০-১৯৯৫)

Dhaka University Institutional Repository

সরকার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে আইডিএ, নোরাড, এডিবি, ডিএফআইডি, জাপান সরকারের সহায়তায় সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের কাজ করে। সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের বড় অংশ জুড়ে ছিল ভৌত কাঠামো উন্নয়ন। অসংখ্য পুরাতন স্কুল সংস্কার, নতুন স্কুল নির্মাণ এবং স্কুলের কক্ষ সম্প্রসারণ। বাংলাদেশের জরাজীর্ন স্কুল পুন:নির্মাণ ও সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও স্থানীয় সমাজের নিকট স্কুলকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা হয়। তবে শিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জোরদার, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত প্রসারের সাথে সাথে গুণগত মানেরও উন্নয়ন সম্ভব হয়। এ প্রকল্পের সব থেকে বড় অবদান হচ্ছে, পরিমাণগত সম্প্রসারণ থেকে কীভাবে গুণগত মানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। সেজন্য নতুন প্রকল্পের ধারণা সৃষ্টি। নতুন প্রকল্প হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-১ (১৯৯৬-২০০৩) গ্রহণ করা হয় উন্নয়ন সহযোগিদের সহযোগিতায়।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-১ এ গ্রহীত পদক্ষেপগুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত লক্ষ্যসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সাহায্য করেছে। তবে, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাধারা ও ইংরেজী মাধ্যমের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে এ সকল প্রকল্পে কার্যকর হয় নাই।

প্রকল্প - ১

৩.২ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-১ (১৯৯৬-২০০৩)

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে জাপানি সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির কৌশলপত্র তৈরি করার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি নামে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এটি পিইডিপি-১ নামে পরিচিত। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হিসেবে (১) বিদ্যালয়ের মান এবং প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় দক্ষতা উন্নয়ন; (২) একটি টেকসই খরচ-ফল সম্পৃক্ত এবং উন্নত ব্যবস্থাপনাসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং (৩) মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় বালক-বালিকা সবার অংশগ্রহণ নিশ্চয়তা বিধান স্থির করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ :

Dhaka University Institutional Repository

১. ভর্তির হার ৮৫% থেকে ৯৫%-এ বৃদ্ধি করা;

২. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার ৬০% থেকে ৭০%-এ উন্নীত করা;

৩. শিখন কৃতিত্বের মান ৮৫% সমাপ্তকারীর জন্য সাক্ষরতা, গাণিতিক ও জীবনদক্ষতা সম্পর্কিত যোগ্যতাসমূহ মানসম্পন্ন করা, যা ১৯৯৬ সালে ছিল ৪০%;

৪. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা তত্ত্বাবধান উন্নত করা;

৫. নির্দেশনা সময় ও শিক্ষক উৎপাদনশীলতা/দক্ষতা বাড়িয়ে এবং পুন:ভর্তি ও ঝরেপড়ার হার কমিয়ে শিক্ষার্থী প্রতি চলমান খরচ কমানো;

৬. পাঠ্যপুস্তক পুন:ব্যবহার, বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা বাড়ানো, মেয়ে ও দরিদ্র্য শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বাড়ানোর মাধ্যমে অধিকতর দক্ষতার সাথে শিক্ষাসম্পদ ব্যবহার;

৭. ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ ও তথ্য বিশ্লেষণে জাতীয়, জেলা, থানা ও বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যের উন্নয়ন সাধন।

৮. একটি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের ধারণাপাত্র: এ দলিলের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী দশকে অনেকগুলো প্রকল্পের কর্মসূচি রচিত হয়। এ দলিলে ভর্তির হার বৃদ্ধির বিষয় থাকলেও মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মান উন্নয়ন।

উপরে উল্লেখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জন এবং বিভিন্ন নীতি ও সংস্কার কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে পিইডিপি-১ এ ছয়টি দাতা সংস্থা সাতটি প্রকল্প গ্রহণ করে। নিম্নে প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পসমূহের প্রধান কর্মকাণ্ড বর্ণনা করা হলো (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ২০০৪)।

১. আইডিয়াল প্রকল্প (১৯৯৭-২০০৪)

- বিদ্যালয়, থানা ও জেলাভিত্তিক স্থানীয় পরিকল্পনা, বিদ্যালয় ক্যাচমেন্ট এলাকা মানচিত্র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন।
- ব্যস্থাপনা প্রশিক্ষণ, বহুমুখী শিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি প্রশিক্ষণ, পুনর্গঠন ও স্ব-শিখন পরিবেশের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

- মিনা (ভিডিও, পোস্টার, ফেস্টুন) ও মা সমাবেশের মাধ্যমে যোগাযোগ/সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি।
- শিক্ষা অভিযান।

২. আইডিএ সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প (১৯৯৮-২০০৩)

- নতুন বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও মেরামত, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং থানা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ করা।
- পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ (কাগজ ও ছাপা)।
- প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ প্রতিষ্ঠা।
- বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।
- বিনামূল্যে স্টেশনারী সামগ্রী সরবরাহ।
- গ্রাম পর্যায়ে সামাজিক সচ্চলতা সৃষ্টি।

৩. নোরাড সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প (১৯৯৭-২০০৩)

- নেপ-এর শক্তিশালীকরণ/মানোন্নয়ন।
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম পরিপ্রেক্ষিতে সি-ইন-এড শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও পিটিআই প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।
- ৬০০০ শিক্ষকের সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ।
- পাঠ্যপুস্তকের কাগজ ও শিখন সামগ্রী সরবরাহ।
- টিআরসির জনবল ও সরঞ্জাম।

৪. জার্মান সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২)

- নতুন বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, পুন:নির্মাণ এবং থানা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

- শিক্ষক উন্নয়ন।
- টিআরসি ও সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ।
- সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের ৪২০০ শিক্ষণ শিখন সামগ্রী সরবরাহ।
- সামাজিক সচলতা সৃষ্টি।

৫. ডিএফআইডি সাহায্যপুষ্ট এস্টিম প্রকল্প (১৯৯৮-২০০৪)

- মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা দৃশ্যপট।
- নীতি প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ।
- ইএমআইএস, এমএন্ডই, অর্থ ব্যবস্থাপনা শাক্তিশালীকরণ।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ উন্নতকরণ।
- একাডেমি তত্ত্বাবধান শক্তিশালীকরণ।

৬. এডিবি সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২)

- নতুন বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও মেরামত, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং থানা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ।
- পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রী সরবরাহ ও পুন:ব্যবহার।
- বিদ্যালয়, টিআরসি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অফিসসমূহে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ।
- শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব নিরূপনে জাতীয়ভিত্তিক সামর্থ্য উন্নয়ন।
- শিক্ষক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ।
- সামাজিক সচলতা সৃষ্টি।
- শিক্ষণ/শিখন পরিবীক্ষণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সামর্থ্য প্রতিষ্ঠা (মোহাম্মদ, হোসেইন ২০১২)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-১ এর অর্থায়ন

(১৯৯৬-২০০৩) সালের পিইডিপি-১ এর জন্য ১৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য সহযোগী দাতা সংস্থা এ অর্থায়নে এগিয়ে আসে। যা সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প নামে পরিচিত। এরই বাস্তবায়নে আইডিএ, নোরাড, এডিবি, ডিএফআইডি, জাপান সরকার প্রভৃতি প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে কাজ করে। মোট ২৬টি প্রকল্প বিভাগীয় স্তরে বিভক্ত হয়ে পাঁচ বছরের লক্ষ্য পূরণে নিয়োজিত হয়। উন্নয়ন সহযোগীরা সমন্বিতভাবে নয় বরং এককভাবে অর্থায়ন করেছিল পৃথক পৃথক খাতে।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে বিভিন্ন বিষয়গুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন: অংশগ্রহণ, দক্ষতা ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-১ (১৯৯৬-২০০৩) এর তথ্য বিশ্লেষণ

৩.২.১ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণ

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সামগ্রিক ভর্তির হার :

জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ৬-১০ বছর বয়সী স্কুল গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা গেছে, সামগ্রিক ভর্তির হার ২০০১ সালে ছিল ৯৭ শতাংশ, যা ২০০৫ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৯১ শতাংশে। ভর্তির হারের এ পরিবর্তন নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক (সারণি-১ ও সারণি-২ এ পিইডিপি-১ এর সামগ্রিক ও প্রকৃত ভর্তির হার দেখানো হলো)।

সারণি-১

বাংলাদেশের শিক্ষার প্রকৃত ভর্তির হার (NER) ১৯৯৭-২০০৫

বৎসর	৬-১০ বছরের শিশুদের সংখ্যা			১ম-৫ম শ্রেণীতে প্রকৃত ভর্তি ও ভর্তি হার		
	ছেলে ও মেয়ে উভয়	ছেলে	মেয়ে	ছেলে ও মেয়ে উভয়	ছেলে	মেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৭	১৮,৮৬১,৫৮৩	৯,৬৭৫,৯৯২	৯,১৮৫,৫৯১	১৫,৪৮৬,৩৬০ (৮২.১%)	৮,০৩৫,৪১০ (৮৩.০%)	৭,৫৬৭,৯০৫ (৮২.৪%)
১৯৯৮	১৯,০৭৯,৮৮৮	৯,৭৬০,৫৫০	৯,৩১৯,৩৩৮	১৫,৮৩৬,৩০৭ (৮৩.০%)	৮,১৯৬,৪০৮ (৮৩.৯%)	৭,৬৭৮,০৯৮ (৮২.৪%)
১৯৯৯	১৮,৩০৭,২৬৫	৯,২৯৪,৮২৬	৯,০১২,৪৩৯	১৫,২১৩,৩৩৭ (৮৩.১%)	৭,৮০৫,৩১৭ (৮৩.৯%)	৭,৫৩০,১১৬ (৮৩.৫%)
২০০০	১৮,২৯৬,৩১২	৯,৩৫১,০৬২	৮,৯৪৫,২৫০	১৫,৩৬৮,৯০২ (৮৪.০%)	৭,৭৬৫,৫৭২ (৮৩.০%)	৭,৬৮২,১৫২ (৮৫.৯%)
২০০১	১৮,১১৪,২০১	৯,২৩৬,৪৩২	৮,৮৮৭,৭৬৯	১৫,৩৯৭,০৭১ (৮৫.০%)	৭,৬৭০,৩৭৮ (৮৩.০%)	৭,৭২৭,৫০২ (৮৭.০%)
২০০২	১৮,০৪০,০২৩	৯,১৫৪,৮৪৬	৮,৮৮৫,১৭৭	১৫,৩৩৪,০২০ (৮৫.০%)	৭,৬০২,৬২৫ (৮৩.০%)	৭,৭৩৩,৯৫০ (৮৭.০%)
২০০৩	১৭,৫৯২,২৯২	৯,২২২,০৩০	৮,৩৭০,২৬২	১৬,২৫৫,২৭৮ (৯২.৪%)	৮,০০১,৪৯৬ (৮৬.৭%)	৮,২৫৯,৭১৭ (৯৮.৭%)
২০০৪	১৭,৬৭১,০৮৭	৯,২৩২,৭৪০	৮,৪৩৮,৩৪৭	১৬,২৫৭,৪০০ (৯২.০%)	৮,০৯৬,৭৫৫ (৮৭.৭%)	৮,১৩০,৫২৫ (৯৬.৩%)
২০০৫	১৭,৩১৫,২৯৬	৮,৮৬৮,৮১০	৮,৪৪৬,৪৮৬	১৫,০৯৮,৯৩৮ (৮৭.২%)	৭,৫০৫,৬৭৪ (৮৪.৬%)	৭,৬১০,২৮৪ (৯০.১%)

সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ।

সারণি-২

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা : সামগ্রিক ভর্তি, ভর্তি হার (GERs) ১৯৯৭-২০০৫

বৎসর	৬-১০ বছরের শিশুদের সংখ্যা			১ম-৫ম শ্রেণীতে সামগ্রিক ভর্তি		
	ছেলে ও মেয়ে উভয়	ছেলে	মেয়ে	ছেলে ও মেয়ে উভয়	ছেলে	মেয়ে
১৯৯৭	১৮,৮৬১,৫৮৩	৯,৬৭৫,৯৯২	৯,১৮৫,৫৯১	১৮,০৩১,৬৭৩ (৯৫.৬%)	৯,৩৬৪,৮৯৯ (৯৬.৮%)	৮,৬৬৬,৭৭৪ (৯৪.৩%)
১৯৯৮	১৯,০৭৯,৮৮৮	৯,৭৬০,৫৫০	৯,৩১৯,৩৩৮	১৮,৩৩৭,৩৯৬ (৯৬.১%)	৯,৫৬৪,৭৮১ (৯৭.৯%)	৮,৭৭২,৬১৫ (৯৪.১%)
১৯৯৯	১৮,৩০৭,২৬৫	৯,২৯৪,৮২৬	৯,০১২,৪৩৯	১৭,৬২১,৭৩১ (৯৬.৩%)	৯,০৬৫,০১৯ (৯৭.৫%)	৮,৫৫৬,৭১২ (৯৪.৯%)

Dhaka University Institutional Repository

২০০০	১৮,২৯৬,৩১২	৯,৩৫১,০৬২	৮,৯৪৫,২৫০	১৭,৬৬৭,৯৮৫ (৯৬.৬%)	৯,০৩২,৬৯৮ (৯৬.৬%)	৮,৬৩৫,২৮৭ (৯৬.৫%)
২০০১	১৮,১১৪,২০১	৯,২৩৬,৪৩২	৮,৮৮৭,৭৬৯	১৭,৬৫৯,২২০ (৯৭.৫%)	৮,৯৮৯,৭৯৫ (৯৭.৩%)	৮,৬৬৯,৪২৫ (৯৭.৬%)
২০০২	১৮,০৪০,০২৩	৯,১৫৪,৮৪৬	৮,৮৮৫,১৭৭	১৭,৫৬১,৮২৮ (৯৭.৩%)	৮,৮৪১,৬৪৮ (৯৬.৬%)	৮,৭২০,১৮০ (৯৮.১%)
২০০৩	১৭,৫৯২,২৯২	৯,২২২,০৩০	৮,৩৭০,২৬২	১৮,৪৩১,৩২০ (১০৪.৭%)	৯,৩৫৮,৭৫৭ (১০১.৫%)	৯,০৭২,৫৬৩ (১০৮.৪%)
২০০৪	১৭,৬৭১,০৮৭	৯,২৩২,৭৪০	৮,৪৩৮,৩৪৭	১৭,৯৫৩,৩০০ (১০১.৬%)	৯,০৪৬,৪৩৩ (৯৭.৯%)	৮,৯০৬,৮৬৭ (১০৫.৫%)
২০০৫	১৭,৩১৫,২৯৬	৮,৮৬৮,৮১০	৮,৪৪৬,৪৮৬	১৬,২১৯,৪৭৯ (৯৩.৭%)	৮,০৮৯,৩৭১ (৯১.২%)	৮,১৩০,১০৭ (৯৬.২%)

সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ।

সামগ্রিক ভর্তি সংখ্যা ও প্রকৃত ভর্তি সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই ছেলে শিশুদের তুলনায় মেয়ে শিশুরা একটি বিপরীত চিত্রকে তুলে ধরেছে। ছেলে শিশুদের সামগ্রিক ভর্তির সর্বোচ্চ সংখ্যা ১৯৯৭ সালের ৮.৪ মিলিয়ন থেকে কমে ২০০৫ সালে ৭.৫ মিলিয়নে পৌঁছে। পক্ষান্তরে মেয়েদের প্রকৃত ভর্তি স্থিতিমূলকভাবে ১৯৯৭ সালে ৭.৫৭ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে ৭.৬ মিলিয়ন-এ দাঁড়িয়েছে।

চিত্র- ১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা: প্রকৃত ভর্তির হার ১৯৯৭-২০০৫

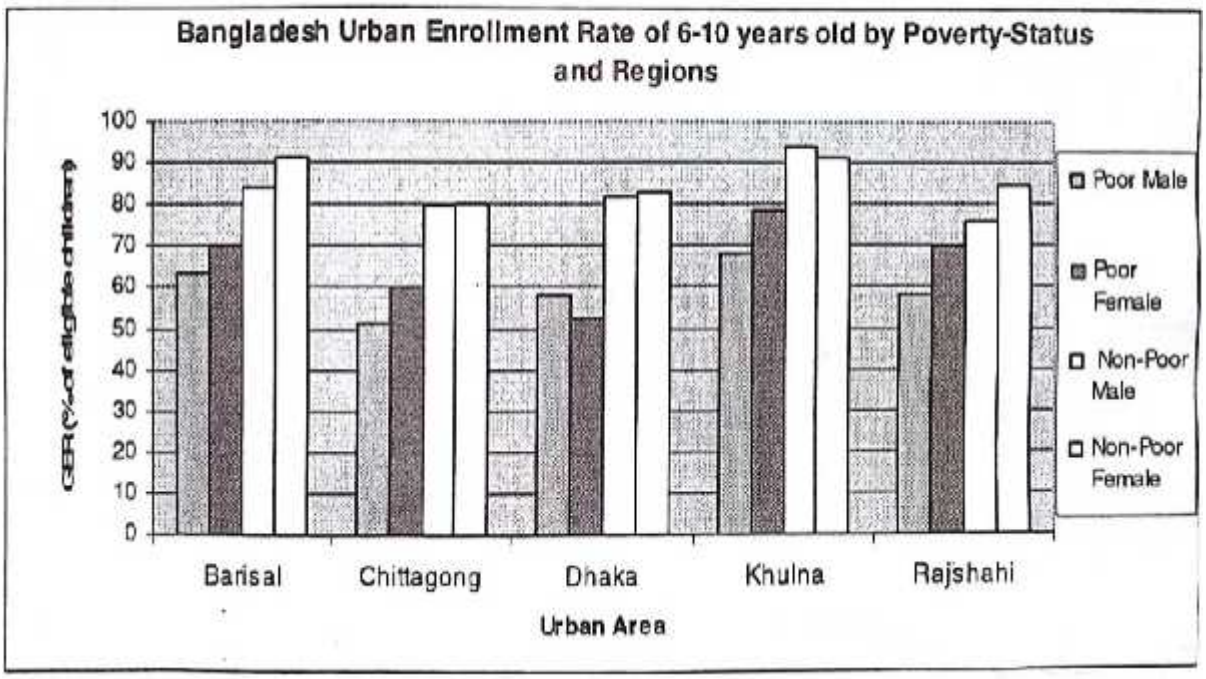

সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ।

সারাদেশের প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা জরিপে দেখা যায় যে, ৫২-৬০ শতাংশ দরিদ্র্য (অনপেক্ষ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী) পরিবার তাদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে, অন্যদিকে ৯০-৯৫ শতাংশ স্বচ্ছল পরিবার তাদের ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে। অবস্থাভেদে এই হার ভিন্ন – এক্ষেত্রে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের তুলনায় খুলনা ও বরিশাল অনেক এগিয়ে (চিত্র ৩ ও ৪)। একই রকম চিত্র লক্ষ্য করা যায় শহরের বিভিন্ন অঞ্চল বা এলাকাভেদে। যেমন- খুলনা ও বরিশাল বিভাগের প্রধান শহরগুলোর তুলনায় রয়েছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের প্রধান শহরগুলো পিছিয়ে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) পরিচালিত পারিবারিক আয় ও ব্যয় জরিপ (২০০৫) এবং এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদন (২০০৬)-এ দেখা গেছে যে, এমন কোনো স্বচ্ছল পরিবার নেই যারা তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৩

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় মূল ধারার বিদ্যালয়সমূহের ফলাফল

বৎসর	অংশগ্রহণকারী		পাশের হার (শতকরা)	
	সংখ্যা	৫ম শ্রেণীতে ভর্তিকৃত (শতকরা হার হিসেবে)	উভয় (ছেলে ও মেয়ে)	মেয়ে
২০০২	৪৫১,০৩৩	২১.৬%	৪৪.২%	৪১.২%
২০০৩	৪৫২,৪১৫	২১.৯%	৫১.৯%	৪৮.৮%
২০০৪	৪৮৭,৪০০	২৩.৫%	৫৪.২%	৫১.০%
২০০৫	৬০৪,৩৫৯	৩১.৬%	৬৭.২%	৬৫.১%

সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-১ (১৯৯৬-২০০৩) শিক্ষার পরিমাণগত তথা অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। দরিদ্র্য পরিবারের সন্তানদের বিদ্যালয়মুখী করতে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। এ সময় সামগ্রিক অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু, অঞ্চল ভেদে পৃথকভাবে উন্নয়ন সহযোগিদের অংশগ্রহণ দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সমানভাবে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করতে পারে নাই।

৩.২.২ দক্ষতা

দক্ষতার মান নির্ণয়ে পঠিত বিষয়াবলীর উপর শিক্ষার্থীর দক্ষতাকে বোঝায়। বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের অর্জন অন্যদের তুলনায় ভালো। গণিত, ইংরেজী, বিজ্ঞানের মত বিষয়গুলোতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী দূর্বল। সকল বিষয়ে গড় নম্বরের ক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রেজিস্টার্ড বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে এগিয়ে ছিল। CAMPE কর্তৃক ২০০০ সালের এডুকেশন ওয়াচ জরিপের মাধ্যমে দক্ষতার অভীক্ষা বা টেস্ট আইটেম ব্যবহৃত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, (৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে) ২৭টি প্রান্তিক যোগ্যতার মূল্যায়ন করা হয়েছিল। সকল বিষয়ের গড় নম্বরে ভৌগলিক

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলভেদে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়। সকল বিষয়ে গড়ে সবেচেয়ে ভাল ফলাফল অর্জনকারী ঢাকা, খুলনা বা বরিশাল এবং দূর্বল সাধারণত সিলেট, রংপুর, পার্বত্য অঞ্চল ফলাফল অর্জনকারীরা। সকল বিষয়ে গড়ে ছাত্রদের অর্জন ছাত্রীদের তুলনায় সামান্য ভাল। গ্রামের শিক্ষার্থীদের তুলনায় শহরের শিক্ষার্থীদের অর্জন কিছুটা ভাল। এ ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিশেষজ্ঞ সৈয়দ মাহাফুজ আলী বলেন, "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নতুন পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যক্রম তৈরি করে। এছাড়াও শিক্ষক পঠন সহায়ক গাইড, শিক্ষণ পদ্ধতি, নুতন পাঠ্য শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেয়ার পরে try out করে শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের মতামতের বিবেচনায় ভুল সংশোধন করে পাঠ্যের সংশোধন করে। পিইডিপি-১ এর সবথেকে বড় ব্যর্থতা হলো আমরা শুধু শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিতে পেরেছিলাম কিন্তু শিক্ষা সহায়ক গাইড শিক্ষকদের হাতে দিতে পারি নাই এবং try out তথা ভুল সংশোধনও করা হয় নাই। এভাবে শিক্ষার্থীরা দশ বছর ভুল বই পড়েছে। পিইডিপি-২ এর শেষে এই সমস্যা অনেকটা দূর করা হয়েছিল" (সাক্ষাৎকার, সৈয়দ মাহাফুজ আলী, ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৪)। অর্থ্যাৎ ২০০১-এ নতুন বইগুলোর সংশোধিত সংস্করণ ছাড়াই বিদ্যালয়গুলো পাঠদান করায়। প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণে পিইডিপি-১ কার্যত কর্তৃপক্ষের অবহেলার শিকার। পিইডিপি-১ এর এই ব্যর্থতার দুটো অন্যতম কারণ- প্রকল্প শেষে বরাদ্দকৃত অর্থের সমন্বয়হীন ব্যবহার ও যথাযথ মনিটরিং-এর অভাব।

৩.২.৩ শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়

গুণগতমান ও পরিমাণগত দিক থেকে বিদ্যালয়ের কৃতিত্ব পরিমাপের জন্য শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট অনান্য বিষয়ের মূল্যায়ন আবশ্যক। যেমন, ২০০৩ পর্যন্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হার ছিল ১:৪৬ থেকে ১:৫৮ এর মধ্যে। এই সূচক মোটেই সন্তোষজনক নয়। শিক্ষকদের এক-চতুর্থাংশ সি-ইন-এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (চাকুরীকালীন মৌলিক প্রশিক্ষণ)। প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজকর্ম তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা বিশেষ করে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাজের ধরণ অনেকটা যান্ত্রিক প্রকৃতির, যা শিক্ষকদেরকে শিক্ষা প্রদান কাজে আগ্রহী করে তুলতে ব্যর্থ।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার ব্যক্তিগত বেসরকারি ব্যয় অনেক বেশি। এডুকেশন ওয়াচ, ২০০০-এর মতে, এ ব্যয় গ্রামের ক্ষেত্রে ছেলে শিক্ষার্থী পিছু ছিল বছরে ২০ মার্কিন ডলার এবং শহরের ক্ষেত্রে ছেলে শিক্ষার্থী পিছু বছরে ১০৬ মার্কিন ডলার। তবে এ ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয় প্রাইভেট পড়ার খরচ যোগাতে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (DPE) ২০০৫ সালের জরিপভিত্তিক তথ্যে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা পরিষদ (School Management Committee বা SMC) ও শিক্ষক অভিভাবক পরিষদ (PTA) কার্যকর সংগঠন নয়। তারা অভিভাবক বা স্থানীয় ব্যক্তিদের সম্ভাবনা ও শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো এবং এ উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখার জন্য জবাবদিহিতা ও বিকাশমূলক কোনো অবদান রাখতে পারছে না। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা পরিষদ (SMC) নিয়মিতভাবে সভার আয়োজন করে না। তাছাড়া অভিভাবক ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের সুফলকে সরকারি কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণ কাজে লাগাতে আগ্রহী নয়।

প্রকল্প-২

৩.৩ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ (২০০৩-২০০৯)

বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি অন্যতম। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ২০০৫ সাল থেকে কাজ শুরু হলেও ২০০৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর-এ কর্মসূচির ধারণাপত্র অনুমোদন এবং একই বছর ২৩শে অক্টোবর-এর কার্যক্রমপত্র চূড়ান্ত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পিইডিপি-২ নামের এ মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা একটি দীর্ঘদিনের সমীক্ষা প্রক্রিয়ার ফসল। মূলত দাতাগোষ্ঠী বিশেষ করে এডিবি এবং কতিপয় দ্বিপাক্ষিক সাহায্যকারী সংস্থা যেমন, ডিএফআইডি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও নেদারল্যান্ড সরকারের সাহায্যে একটি ব্যতিক্রমী পরিকল্পনা বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে সর্বপ্রথম গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনা দলিলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে স্থান পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য PSQL (Primary School Quality Level) নিশ্চিতকরণে পিইডিপি-২ একটি মূল অবলম্বন। PSQL কে সামনে রেখে সাজানো হয়েছে পিইডিপি-২

Dhaka University Institutional Repository

এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান। যথা: শ্রেণিকক্ষ/বিদ্যালয়ের অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণ, নতুন শিক্ষকের যোগান, শিক্ষক প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ ও মান-উন্নয়ন, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি) এবং অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির (পিটিএ) কার্যক্রমকে যুগোপযোগীকরণ। পিছিয়ে পড়া ও আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী/পরিবারকে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার কথা পিইডিপি-২ তে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত লক্ষ্যসমূহ যথা সবার জন্য শিক্ষা এবং জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের (এমডিজি) সঙ্গে পিইডিপি-২ তে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সঙ্গতিপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে ১১টি উন্নয়ন সহযোগীর আর্থিক সহায়তায় পিইডিপি-২ বাস্তবায়িত হয়েছে। পিইডিপি-২ এর প্রণয়ন কাজে দেশীয় পরামর্শকরা দাতাগোষ্ঠীর সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে। ফলে পিইডিপি-২ এর পরিকল্পনা ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ এবং সর্বোপরি একনেক বা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এ কর্মসূচি মূলত নয়টি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল। উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মানদণ্ড প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন;

খ) বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রবেশ-উপযোগী করে তোলা;

গ) ভর্তি, উপস্থিতি এবং পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনীর হার বৃদ্ধি করা;

ঘ) শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কাজে শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা;

ঙ) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য PSQL (Primary School Quality Level) নিশ্চিতকরণ;

চ) বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ প্রদান;

ছ) শিক্ষক প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়ন, নতুন শিক্ষকের যোগান;

জ) শিক্ষা, শিখন ও পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণ এবং

Dhaka University Institutional Repository

ঝ) পিছিয়ে পড়া ও আর্থসামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী পরিবারকে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ প্রদান। বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত লক্ষ্যসমূহ যথা- সবার জন্য শিক্ষা এবং জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের (এমডিজি) সঙ্গে পিইডিপি-২ তে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ এর অর্থায়ন

ছয় বছর মেয়াদি এ কর্মসূচি ডিসেম্বর ২০১০ সাল পর্যন্ত চলে এবং এজন্য মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৮১ কোটি ৬০ লক্ষ মার্কিন ডলার। এ কর্মসূচিতে মোট ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশের যোগান দেয় বাংলাদেশ সরকার এবং এক-তৃতীয়াংশের যোগান দেয় বহুপাক্ষিক দাতা সংস্থা। উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে ছিল এডিবি, ডিএফআইডি, আইডিএ, ইসি, নোরাড, সিডা, সিআইডিএ, জাইকা, ইউনিসেফ ও অস-এইড এবং নেদারল্যান্ড সরকার।

দাতাদের অংশগ্রহণের শতকরা হার	মিলিয়ন ডলার	শতকরা হার (%)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	১১৬১	৬৩.৯%
বিশ্বব্যাংক	১৫০	৮.৩%
ডিএফআইডি	১৫০	৮.৩%
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	১০০	৫.৫%
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক	১০০	৫.৫%
নেদারল্যান্ড সরকার	৫০	২.৮%
নরওয়ে	৪০	২.২%
সুইডেন	২৯	১.৬%
কানাডা	২০	১.১%
ইউনিসেফ এবং ইউএসএইড	১২	০.৭%
জাইকা/জাপান	৩	০.২%

Dhaka University Institutional Repository

মোট	১৮১৫	১০০%

সূত্র : (প্রকল্প নকশা, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ২ জানুয়ারি, ২০০৩।

পিইডিপি-২ এর জন্য মোট ১,৮১৫ মিলিয়ন ডলারের শতকরা ৬৪% বাংলাদেশ সরকার ও ৩৬% উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ সরকারের শতকরা ৬৪ শতাংশের মধ্যে নিজস্ব অর্থায়ন ছিল ৪৫৬২৬৩.১৫ লক্ষ টাকা অর্থ্যাৎ শতকরা ৯৭.৫ শতাংশ এবং বৈদেশিক সাহায্য (আরআরপি) RRP (Report and Recommendation of the President of the Board of Directors)-এর আওতায় এডিবি এবং আইডিএ কর্তৃক ৩৭০৪৪.৮৫ লক্ষ টাকা গৃহীত হয় যা শতকরা ২.৫ শতাংশ। বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত অংশটি প্রকল্প সাহায্য হিসাবে প্রাপ্ত। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ থেকে ২০০৩-এর ডিসেম্বরের মধ্যে এই বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত অংশটি বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করে।

এই অর্থগুলো যে সমস্ত খাতে বরাদ্দ ছিল তা নিম্নরূপ (লক্ষ টাকায়):

ক্রমিক নং	বিবরণ	স্থানীয়	বৈদেশিক	মোট
১.	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	২৫১৯৪০.২০	৭৪৪.০০	
২.	আসবাবপত্র	৬৬২৬৭.৫৬	-	
৩.	প্রশিক্ষণ	৪১,১২৮.১৪	১২৪২.৫০	
৪.	সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ	২০০০	-	
৫.	পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক গাইডলাইন, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, শিক্ষণ উপকরণ	৭১,৭৩০.১৫	২৫৫৬৭.৯৫	
৬.	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	১২৪৭৬.১০	-	

Dhaka University Institutional Repository

৭.	মনিটরিং, পর্যালোচনা	২৩৯১	-	
৮.	প্রাথমিক শিক্ষক রেজিষ্ট্রেশন বোর্ড	১০০০	-	
৯.	বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শিশু ও অস্বচ্ছল পরিবারের উন্নয়ন	৩০০০	-	
১০.	পরামর্শক সম্মানী	২৩৩০	৯৪৯০	
১১.	শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম ও অনান্য	২০০০	-	
		৪৫৭,২৬৩.১৫	৩৭০৪৪.৮৫	১৯৩৩০৮.০০

সূত্র : (প্রকল্প নকশা, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি- ২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ২ জানুয়ারি, ২০০৩।

সারণি-৪

দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির কৃতি সূচকসমূহ (২০০৫-২০০৯)

ক্রমিক নং	কৃতি সূচকসমূহ	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	লক্ষ্যমাত্রা	মন্তব্য
১.	স্কুল ভর্তির হার [EFA 5]	৯৩.৭%	৯৭.৭%	৯৮.৮%	১০২.২%	১০৩.৫%	১০৭.৭%	৯৮%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
২.	প্রকৃত ভর্তির হার [EFA 6]	৮৭.২%	৯০.৯%	৯১.১%	৯১.৯%	৯৩.৯%	৯৪.৮%	৯০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

৩.	পঞ্চম শ্রেণি সমাপনীর হার (Completion rate)	৫২.১%	৪৯.৫%	৪৯.৫%	৫০.৭%	৫৪.৯%	৬০.২%	৫৫%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
৪.	উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা (মিলিয়ন)	৪.৩	৪.৭	৪.৮	৪.৮	৪.৮	৭.৯	বেইজলাইন পর্যায়	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
৫.	৫ম শ্রেণি থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তরণের হার	৯২.৪%	৯৫.৬%	প্রযোজ্য নয়	৯৭.৫%	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৯৬%	-
৬.	শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় মোট জাতীয় আয়ের (GNP) শতকরা হার	১.৯৩%	২.১৯%	২.২৮%	২.১৪%	২.০০%	২.৩%	২.৮০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি
৭.	প্রাথমিক শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়, মোট শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়ের শতকরা হার	৩৭.১%	৪১.২%	৩৯.৫%	৪৩.৮%	৪৫.৪%	৪৫%	৪৫%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
৮.	শিক্ষার্থী অনুপস্থিতির হার	২৩%	২০%	২০%	১৯%	১৮%	১৬.৬%	১৮%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
৯.	শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত	৫৪	৫৪	৪৯	৫০	৫১	৪৭	৪৬	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
১০.	পুনরাবৃত্তির হার ১ম শ্রেণি	১২.৩%	১১.৫%	১১.৯%	১১.৩%	১১.৪%	১১.৪%	১০% এর নিচে	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
	২য় শ্রেণি	১১.০%	১০.৭%	১১.২%	১১.০%	১১.৭%	১২.১%	১০% এর নিচে	
	দক্ষতা ৩য় শ্রেণি	১৩.৭%	১৩.৮%	১৪.৯%	১৪.৫%	১৫.৪%	১৪.১%	১০% এর নিচে	
	৪র্থ শ্রেণি	১১.৪%	১৩.০%	১৪.৪%	১৩.৭%	১৫.৬%	১৬.৫%	১০% এর নিচে	
	৫ম শ্রেণি	৫.৭%	৫.৬%	২.২%	৫.২%	৩.১%	৭.১%	৫% এর নিচে	

১১.	Ideal as % of actual	৬০.৬%	৫৯.০%	৫৮.৮%	৫৮.৩%	৬১.০%	৬২.২%	-	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি তবে অগ্রগতি হচ্ছে
	Years Input	৮.১	৮.৫	৮.৫	৮.৬	৮.২	৮.০	৭.৫	
	ঝরে পড়ার হার	১২.৯%	১৩.৯%	১৪.৪%	১৩.২%	১১.১%	৮.৫%		

Dhaka University Institutional Repository

	গ্রেড-১								
	গ্রেড-২	৮.৮%	১০.২%	১০.১%	৮.৮%	৭.৬%	৩.০%		লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি
১২.	গ্রেড-৩	১৩.৪%	১২.৭%	১২.৭%	৯.০%	১০.৪%	৭.৭%	প্রতি বছর শতকরা ২	G1-3 এ অগ্রগতি হচ্ছে
	গ্রেড-৪	১৬.০%	১৮.০%	১৪.৬%	১৬.৭%	১১.৯%	১২.২%	ভাগ হারে হ্রাস পাচ্ছে	G1-5 এ আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছে না
	গ্রেড-৫	০.০%	১.১%	৪.০%	৭.০%	৭.৭%	৯.৫%		
১৩.	৪র্থ শ্রেণি ও তার উপরে শ্রেণির শিক্ষার্থী যারা জাতীয় পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করেছে								
	গড় স্কোর ৫ম শ্রেণি বাংলা		৫৬.১৮		৬৮.৫১			লক্ষ্যমাত্রা ছিল না	
	গড় (Mean) স্কোর ৫ম শ্রেণি গণিত (NSA)		৪৬.৭১		৬৩.২৬			লক্ষ্যমাত্রা ছিল না	
১৪.	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী ভর্তি	৪৫,৬৮০	৪৭,৫৭০	৫৩,৩০৩	৭৭,৪৮৮	৭৮,১৯৯	৮৩,০২৩	৫% বার্ষিক প্রবৃদ্ধি	লক্ষ্যমাত্র অর্জিত হয়েছে

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ এর দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণকে তরান্বিত করা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এ লক্ষ্য অর্জনের আগেই বর্তমান প্রজন্মের বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের একটি অংশকে তাদের জীবন ধারনের জন্য কাজে নিয়োজিত হতে হয়। সে কারণে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে মধ্য মেয়াদি ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রেখে। আর তাই উল্লিখিত বিষয়গুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন: অংশগ্রহণ, দক্ষতা ও শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়।

৩.৩.১ অংশগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

২০০৫-২০০৮ মেয়াদকালে ১ম শ্রেণিতে স্থুল ভর্তির হার অর্থাৎ মোট শিশুর তুলনায় প্রথমবারের মত প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া শিশুর হার ১০৭-১০৮%, যা মোটামোটি স্থির, কিন্তু ২০০৯ সালে ১১৫% এবং ২০১০ সালে ১১৭%-এ উন্নীত হয়। একইভাবে ২০০৫-২০০৮ মেয়াদকালে প্রকৃত ভর্তির হার (net intake) (অর্থাৎ ৬ বছর বয়সী মোট শিশুর তুলনায় প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া শিশুর হার) স্থির ছিল অর্থাৎ ৯৪-৯৫%, কিন্তু ২০০৯-২০১০ এর মধ্যে এটা বেড়ে ৯৯%-এ উন্নীত হয়।

নিচের সারণি ২.২ এ স্থুল ও প্রকৃত ভর্তির তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

- স্থুল ভর্তির হার, অন্য কথায়, ৬-১০ বছর বয়সী (প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সরকারি বয়স) মোট শিশুর তুলনায় যে কোনো বয়সের ১ম-৫ম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিশুর হার ২০১০ সালে ছিল ১০৭.৮% এবং আর ২০০৫ সালে যা ছিল ৯৩.৭%।
- প্রকৃত ভর্তির হার, অন্য কথায়, ৬-১০ বছর বয়সী (প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সরকারি বয়স) মোট শিশুর মধ্য থেকে কতজন ১ম-৫ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে তার হার। ২০১০ সালে প্রকৃত ভর্তির হার ৯৫.৬% ছিল ২০০৫ সালে যা ছিল ৮৭.২%।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৫

স্থূল ও প্রকৃত ভর্তির হার (Gross and Enrolment Rates)

	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০
১ম-৫ম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী GPS ও RNGPS	১৩,০৫৬,৫৭৭	১২,৯৩৯,১২৯	১২,৯১৬,৫২২	১৩,০১০,৩৭০	১৩,২৮১,১৯৪	১৩,৫৫৪,৮৭৮
১ম-৫ম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী, সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান	১৬,২২৫,৬৫৮	১৬,৩৮৫,৮৪৭	১৬,৩১২,৯০৭	১৬,০০১,৬০৫	১৬,৫৩৯,৩৬৩	১৬,৯৫৭,৮৯৪
১ম-৫ম শ্রেণির ৬-১০ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রী সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান	১৫,১১৪,১০২	১৫,২৪৪,৬৩০	১৫,০৪১,৭৪৩	১৪,৮৮০,২৪৯	১৪,৯৪৭,০০২	১৪,৯৩৭,৫১৭
৬-১০ বছর বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা	১৭,৩১৫,২৯৬	১৬,৭৭১,৭৭৬	১৬,৫১৪,৪১৯	১৬,৩৯০,২২১	১৫,৯৮২,৭৪৪	১৫,৭৫১,৭৮৮
স্থূল ভর্তির হার (%)	৯৩.৭%	৯৭.৭%	৯৮.৮%	৯৭.৬%	১০৩.৫%	১০৭.৭%
বালক	৯১.২%	৯২.৯%	৯৩.৪%	৯২.৮%	১০০.১%	১০৩.২%
বালিকা	৯৬.২%	১০৩.০%	১০৪.৬%	১০২.৯%	১০৭.১%	১১২.৪%
লিঙ্গ সমতা নির্দেশক	১.০৫%	১.১১%	১.১২%	১.১১%	১.০৭%	১.০৯%
প্রকৃত ভর্তির হার (%)	৮৭.২%	৯০.৯%	৯১.১%	৯০.৮%	৯৩.৯%	৯৪.৮%
বালক	৮৪.৬%	৮৭.৬%	৮৭.৮%	৮৭.৯%	৮৯.১%	৯২.২%
বালিকা	৯০.১%	৯৪.৫%	৯৪.৭%	৯৪.০%	৯৯.১%	৯৭.৬%
লিঙ্গ সমতা নির্দেশক	১.০৭%	১.০৮%	১.০৮%	১.০৭%	১.১১%	১.০৬%

সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, ২০১১।

সারণি ২.২ এ দেখানো হয়েছে ২০০৮ সালের পর থেকে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬-১০ বছর বয়সী ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৭,৩০,০০০ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। মোটের ওপর ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে এ বৃদ্ধির হার ৪.৫%। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রজেকশন অনুযায়ী একই সময় ৯% হারে ৬-১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা কমেছে (যদিও জাতিসংঘ জনসংখ্যা বিভাগের কোহর্ট-

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী জনসংখ্যার আকার এ সময়ে স্থির ছিল)। ফলস্বরূপ ৬-১০ বয়সী শিশুর সংখ্যা ও বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য কমে আসছে।

৩.৩.২ দক্ষতা

অভ্যন্তরীণ দক্ষতা সূচকের (Internal efficiency index) মাধ্যমে জানা যায় কীভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর শিক্ষণ মান বৃদ্ধি করে। যেমন- প্রতি শ্রেণীতে উত্তীর্ণের হার ছিল (Promotion rate) ২০০৯ সালে প্রায় ৮২ শতাংশ (চিত্র ৫)। প্রত্যাশিতভাবেই শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ দক্ষতা সূচক তুলনামূলকভাবে ভাল। ২০০৫-২০১২ সময়কালে দক্ষতা সূচক ছেলে শিশুরা ২০০৬-এ ৫৬, ২০০৮-এ ৫৭, ২০১০-এ ৬২ এবং ২০১২-এ ৭৫। পক্ষান্তরে মেয়ে শিশুরা ২০০৬-এ ৬১, ২০০৮-এ ৬২, ২০১০-এ ৬১ এবং ২০১২-এ ৭৯ শতাংশ। এক্ষেত্রেও গ্রামের শিশুদের অভ্যন্তরীণ দক্ষতার সূচক শহরাঞ্চল অপেক্ষা দুর্বল। উল্লেখ্য যে, তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের দক্ষতার মান বেশি।

সারণি-৬

অভ্যন্তরীণ দক্ষতা সূচক হার (২০০৫-২০১২)

বছর	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
ছেলে	৫৮%	৫৬.৬%	৫৬.৫%	৫৭.৫%	৫৯.১%	৬২.৮%	৬৭.৭%	৭৫.৬%
মেয়ে	৬৩.২%	৬১.৩%	৬১.১%	৫৯.১%	৬২.৮%	৬১.৮%	৭০.৫%	৭৯.২%
উভয়	৬০.৬%	৫৯.০%	৫৮.৮%	৬১.০%	৬১.০%	৬২.৩%	৬৯.১%	৭৭.৪%

সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ।

জাতীয়ভাবে তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মূল্যায়ন জরিপ

শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন করার জন্য জাতীয়ভাবে তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মূল্যায়ন জরিপের ডিজাইন করা হয়েছে। এ জরিপ প্রতি দু'বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিতব্য জরিপে ৭২০টি বিদ্যালয়ের প্রতি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ২৫ জন পর্যন্ত শিক্ষার্থী ও পঞ্চম শ্রেণির ২০ জন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হয়। মোট নমুনা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০,০০০ জন। প্রতিটি কৃতি অভীক্ষার দুটি অংশ; MCQ ধরন ও SSQ ধরন। সবগুলো কৃতি অভীক্ষা শিখনফলের (learning outcomes, LOs) নির্ধারিত তালিকা থেকে নির্বাচন করা হয়েছে যা শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক নির্ধারিত করা (তৃতীয় শ্রেণির বাংলা, গণিত এবং পঞ্চম শ্রেণির বাংলা, অংক, ইংরেজী, বিজ্ঞান ও সমাজ)। একটি নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনে মোট নম্বরের মধ্যে ৫০% বা তার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে তাদেরকে উল্লিখিত শিখনফল অর্জনকারী চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০০৮ সালের জরিপ বাংলা এবং গণিতের ফলাফল সারণি ২.৫ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্জিত ফলাফল ছিল সন্তোষজনক (এ অর্থে যে, নির্ধারিত শিখনফল ক্যাটাগরি অর্ধেকের বেশি সঠিক উত্তর ৫০% বা তার চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী দিয়েছিল যা শিখন ফলের ‘গড়ের’ ক্ষেত্রে এবং সব বিষয়ের উভয় শ্রেণির ‘গড়ের’ ক্ষেত্রেও) যেমন, তৃতীয় শ্রেণির বাংলায় প্রাপ্ত গড় নম্বর ছিল ৬৭% এবং পঞ্চম শ্রেণির বাংলায় গড় নম্বর ছিল ৬৯%।

- বিষয়ের শিখনফল ক্যাটাগরি (LOC) মাস্টারি বা পরিপূর্ণ শিখনের ক্ষেত্রে সব বিষয়ের ফলাফল খুবই খারাপ। তৃতীয় শ্রেণি বাংলায় সবগুলো শিখনফল ক্যাটাগরি (LOC) মাস্টারি বা পরিপূর্ণ শিখন অর্জন করেছে মাত্র ১.৭% জন শিক্ষক। অনুরূপভাবে পঞ্চম শ্রেণির বাংলায় ১৩.৭% জন, তৃতীয় শ্রেণির গণিতে ১.০% জন, পঞ্চম শ্রেণির গণিতে ৩.১% জন হতাশাজনক। অর্থ্যাৎ শিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াগত সমস্যা রয়েছে। যা শিক্ষার্থিদের অভ্যন্তরীণ দক্ষতায় ঘাটতি তৈরি করে।
- ফলাফল অর্জনের ভিন্নতা অনুসারে সকল বিষয়ের গড় নম্বরে ভৌগলিক অঞ্চলভেদে গুরূত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়। সকল বিষয়ে গড়ে সবেচেয়ে ভাল ফলাফল অর্জনকারী (খুলনা বা বরিশাল) এবং সবেচেয়ে খারাপ ফলাফল অর্জনকারীর (সাধারণত সিলেট) মধ্যে ২% পার্থক্য দেখা যায়। গ্রামের শিক্ষার্থীদের তুলনায় শহরের শিক্ষার্থীদের অর্জন কিছুটা ভাল। সকল বিষয়ে গড় নম্বরের ক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রেজিস্টার্ড বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে এগিয়ে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৭

২০০৮ সালের জাতীয়ভাবে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন জরিপের ফলাফল, বাংলা এবং গণিত

		বাংলা		গণিত	
		৩য় শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৫ম শ্রেণি
জাতীয় গড় নম্বর	মোট	৬৭	৬৯	৫৯	৬৩
	মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন (MCQ)	৭৬	৭০	৭৬	৭৮
	সংক্ষিপ্ত গঠনমূলক প্রশ্ন (SSQ)	৫৩	৬৬	৩৩	২৭
	বালক	৬৭	৭০	৫৯	৬৪
	বালিকা	৬৭	৬৮	৫৮	৬২
	শহর (Urban)	৭১	৭৫	৫৮	৬৫
	গ্রাম (Village)	৬৬	৬৮	৫৯	৬৩
	সরকারি (GPS)	৬৮	৭০	৫৯	৬৫
	রেজিস্টার্ড বেসরকারি (RNGPS)	৬৪	৬৪	৫৮	৫৯
যে সকল শিক্ষার্থী নম্বর	৫০% বা তার চেয়ে বেশি	৮৫	৮৭	৬৭	৭৮
পেয়েছে তাদের হার:	৮০% বা তার চেয়ে বেশি	২৩	২৭	১৮	২০

Dhaka University Institutional Repository

সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, ২০০৯।

সারণি- ৮

নির্দিষ্ট শিখনফলের মাস্টারিং, ২০০৬ এবং ২০০৮ সালের NSA

	বিষয়	শিখনফলের সাধারণ ক্যাটাগরি	মাস্টারি সাধারণ LOCs (%)	
			২০০৬ (%)	২০০৮ (%)
৩য় শ্রেণি	বাংলা	পড়া ও অনুধাবন (Comprehension)	২৯.৮	৫৩.১
		লেখা	৫.১	১৩.৬
	গণিত	সংখ্যার ধারণা	১৬.৬	৫৮.৪
		গাণিতিক প্রয়োগ	১৮.৪	৫৭.৬
		সমস্যা সমাধান	৩৫.৪	৭.৯
		একক ও পরিমাপ	২৪.১	২১.১
		জ্যামিতিক আকৃতি (Figures)	৩৪.১	১৩.৪
৫ম শ্রেণি	বাংলা	পড়া ও অনুধাবন (Comprehension)	১৩.০	২৬.৫
		লেখা	১৩.৭	২৬.৮
	গণিত	গাণিতিক (যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ)	৯.৪	৪৮.৯
		সমস্যা সমাধান	৮.৩	৩২.৮

Dhaka University Institutional Repository

		জ্যামিতিক আকৃতি (Figures)	২০.৬	৪.০

সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, ২০০৯।

২০০৮ সালের CAMPE জরিপ

NSA জরিপ ছাড়াও CAMPE কর্তৃক ২০০৮ সালের এডুকেশন ওয়াচ জরিপের মাধ্যমে ফলাফল অর্জনের একটি দীর্ঘ মেয়াদি ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ ২০০০ সালের এডুকেশন ওয়াচ জরিপেও একই ধরনের অভীক্ষা বা টেস্ট আইটেম ব্যবহৃত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, (৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে) ২৭টি প্রান্তিক যোগ্যতার মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং এটাই হলো পরিবর্তন। তাছাড়া ২০০০ এবং ২০০৮ সালের শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের ফলাফল তুলনা করার জন্য অভীক্ষায় কোন পরিবর্তন করা হয়নি। ২০০৮ সালে ৪৪০টি বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ৭০০০ জনের বেশি শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হয়েছিল। উপরের চিত্র ২.৫-এ ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০০০ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে গড়ে যতগুলো প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে, তা কম হলেও অগ্রগতির হার উল্লেখযোগ্য।

৩.৩.৩ শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়

প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি জীবন দক্ষতা উন্নয়নের প্রথম সোপান। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-এর অগ্রগতি পরিমাপের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলো নিচে বর্ণিত হলো :

চিত্র- ২

Dhaka University Institutional Repository

প্রমোশন, পুনরাবৃত্তি এবং ঝরে পড়া (Promotion, Repetition and Dropout)

সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ।

শিক্ষার্থী যদি প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্ত করার পূর্বেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে তবে ধরে নেওয়া হয় যে, শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর নয় কিংবা সকল সম্পদের অপচয় হয়।

Reconstructed cohort পদ্ধতি অনুসরণ করে অভ্যন্তরীণ দক্ষতার সূচকসমূহের মান বের করা হয়। আর এটার জন্য পরপর দু'বছরের শ্রেণিভিত্তিক ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং চলতি বছরের পুনরাবৃত্তি শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেখা হয়। এটার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আরও তিনটি ফলাফল জানা যায়; যেমন- হয় তারা উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তি হয় (প্রমোশন) অথবা একই শ্রেণির পুনরাবৃত্তি করে (Repetition) নতুবা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে (dropout)।

Reconstructed cohort পদ্ধতির শুদ্ধতা নির্ভর করে কতগুলো অনুমানের ওপর:

- এটা ধরে নেয়া হয়, পরবর্তী যে কোন বছরে আর অতিরিক্ত কোন নতুন শিক্ষার্থী মূল অন্তর্ভূক্ত হবে না। বাংলাদেশে কিছু কিছু উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে, তারপর শিক্ষার্থীদেরকে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে সচেষ্ট হয়। সুতরাং

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি ও রেজিষ্টার্ড বেসরকারি বিদ্যালয়ে চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণির কিছু কিছু শিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষে এনজিও বিদ্যালয় থেকে এসে ভর্তি হয় এবং যারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে সে সমস্ত শিক্ষার্থীর শূণ্য স্থান পূরণ করে। এ কারণে ঝরে পড়ার হার প্রকৃতপক্ষে কম হয়। যদি বিদ্যালয়গুলো প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির হার অতি রঞ্জিত করে, তবে ঝরে পড়ার হার বেড়ে যাবে। যদিও এক্ষেত্রে বাংলাদেশের দু'ধরনের সমস্যা দেখা গেছে।

- সরকারের নীতি অনুযায়ী দরিদ্র্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪০% শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য, যদি তারা পরীক্ষায় পাশ করে এবং উপস্থিতির নূন্যতম মান অর্জন করে। বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি সাধারণ প্রবণতা হলো প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির সংখ্যা বেশি দেখানো যাতে করে উপবৃত্তির সুবিধা বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে দেওয়া যায়।
- রেজিষ্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রচলিত একটি ধারণা হলো যে, তাদের কমপক্ষে ১৫০ জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে নতুবা তাদের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল হয়ে যাবে। এ কারণেও অনেক রেজিষ্টার্ড বেসরকারি বিদ্যালয় তাদের শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়িয়ে দেখায়।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারি ও রেজিষ্টার্ড বেসরকারি বিদ্যালয়ের কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় উল্লিখিত অনেক বিদ্যালয়েই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদেরকে প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি দেখায়।

অভ্যন্তরীণ দক্ষতা সূচকের ভিত্তি হলো সরকারি, রেজিষ্ট্রার্ড বেসরকারি ও পরীক্ষণ বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ। যদি সব বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দক্ষতা কম হয় ও অন্যান্য বিদ্যালয় যাদের তথ্য সংগ্রহ করা হয় না (যেমন উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় উচ্চ মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক শাখা) তাদের ক্ষেত্রে বেশি হয়, তবে মোটের ওপর ঝরে পড়ার হার বেশি হয়।

সরকারি, রেজিষ্ট্রার্ড বেসরকারি এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ দক্ষতা সূচকসমূহের মান করা হয়। যদি কোন শিক্ষার্থী উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলো থেকে অন্য ধরনের বিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হয়, তবে তাদেরকে ঝরে পড়া হিসেবে গন্য করা হয়। যেহেতু এ সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয় না ফলে ঝরে পড়ার হার বেড়ে যায়। প্রথম থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ঝরে পরার হার দ্রুত কমছে, যদিও পঞ্চম শ্রেণিতে তা বাড়ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ মূল্যায়ন

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলো প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় সম্পন্ন হওয়ার কারণে প্রতিটি প্রকল্প শেষে নতুন বরাদ্দের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নতুন উদ্দ্যোগ গ্রহণ করে, যেমন- সমাপনী পরীক্ষা। কিন্তু এ ধরনের নতুন সিদ্ধান্তের সাথে শিক্ষা বিষেশজ্ঞরা প্রায়শই একমত থাকেন না। রাজনৈতিকভাবে বিদ্যালয় কমিটিগুলোতে সদস্য অন্তর্ভূক্তি যোগ্য শিক্ষক নিয়োগকে প্রভাবিত করে। এ ধরনের কিছু চিত্র নিচে তুলে ধর হল।

সামগ্রিক ভর্তি হার

ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই সামগ্রিক ভর্তি হার (Gross Enrollment Rate বা GER) ১৯৯৭-২০০৪ সময়কালে বৃদ্ধি পেলেও সম্মিলিতভাবে উভয় ধরনের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সামগ্রিক ভর্তি হার ২০০৪-২০০৫ সময়কালে কমে যায়। পিইডিপি-১ এর শেষোক্ত বছরে সামগ্রিক ভর্তি সংখ্যা কমে যাওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো ৬-১০ বছর বয়সী স্কুল গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে। দেখা গেছে, ২০০৫ সালে ৬-১০ বছর বয়সী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী শিশুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭.৩১ মিলিয়ন, ২০০১ সালে যা ছিল ১৮.১১ মিলিয়ন। (সামগ্রিক ভর্তির হার) ২০০১ সালে ছিল ৯৭ শতাংশ, যা ২০০৫ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৯১ শতাংশে। ভর্তির হারের এ পরিবর্তন নি:সন্দেহে উদ্বেগজনক।

পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা

২০০৯ সালে প্রথম বারের মত পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার পরিবর্তে জাতীয়ভাবে সমাপনী পরীক্ষা প্রচলন করা হয়। সমাপনী পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সফলভাবে শেষ করার স্বীকৃতি প্রদান। এ পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফলের জন্য প্রতিযোগীতামুখী করে তুলছে। কিন্তু শুধুমাত্র ভালো ফলাফল প্রত্যাশায় বিদ্যালয় ও অভিভাবকরা বছরের প্রথম থেকে টিউশনি নির্ভর হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে। বিদ্যালয় নয়, কোচিং সেন্টারে অভিভাবকদের আগ্রহ বেশী দেখা যায়। সমগ্র সিলেবাস নয়, বাছাইকৃত প্রশ্নের উত্তরের উপরে প্রস্তুতি নেয়।

বিদ্যালয়ের ধরন অনুযায়ী (উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়সমূহের অন্তর্ভূক্তি যেগুলোর পারফরমেন্স আগে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করা হয়নি) সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, কিছু উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ফলাফল সরকারি ও রেজিস্টার্ড বেসরকারি বিদ্যালয়ের চেয়ে ভালো। উপজেলাভিত্তিক ফলাফলে দেখা যায় যে, খুলনা বিভাগের বিদ্যালয়সমূহ সবচেয়ে ভাল ফল করেছে এবং সিলেট বিভাগে (বিশেষ করে হাওর এলাকা) এবং যমুনা নদীর তীরের চর এলাকার বিদ্যালয়গুলো সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে।

২০১০ সালে ৯৭,৩৪৪ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। প্রায় ৮৮.৭% যোগ্য শিক্ষার্থী (DR ভুক্ত) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং যারা পরীক্ষা দিয়েছে তাদের ৯১.২% পাশ করেছে। সর্বোপরি, ৮০.৯% যোগ্য শিক্ষার্থী (DR ভুক্ত) পরীক্ষায় পাশ করেছে। গ্রেডভিত্তিক ফলাফল প্রকাশে ক্রমশ এ+ এর সংখ্যা বেড়ে গেছে। ভালো ফলাফল সন্তোষ প্রকাশ করা হলেও শিক্ষার মান নিয়ে সচেতন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। এ ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিশেষজ্ঞ মো. মুরশিদ আক্তার বলেন, "শিক্ষা একটি টেকনিক্যাল বিষয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু সার্টিফিকেট অর্জন বা রেজাল্ট ভালো করা নয়। তাই কেবল শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের হাতে এ বিষয়ক সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেওয়া উচিৎ"(সাক্ষাৎকার, মো: মুরশিদ আক্তার, ২০শে মার্চ, ২০১৪)। রাজনৈতিকভাবে প্রশংসিত ফলাফলের অধিকারী একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষণ দক্ষতায় ঘাটতি দেখা যায়। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে পুরো পাঠের প্রতি মনোযোগী না হয়ে বাছাইকৃত সিলেবাসে অধিক মনোযোগ থাকে। গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো ভালো ফলাফলের আশায় অনেক সময় দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। নৈবিত্তিক প্রশ্নমালার সমাধানে শিক্ষকরা সাহায্য করে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফলের উপরে উপবৃত্তি, বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন প্রভৃতি নির্ভর করে বিধায় বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীর সঠিক সংখ্যা, পরীক্ষার পরিবেশ প্রায়শই যথার্থভাবে প্রকাশিত হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠদানের সময়

শনি থেকে বৃহস্পতি সাপ্তাহিক ছয়দিনের হিসাবে বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ বিদ্যালয়ে (সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৮৮ শতাংশ বিদ্যালয় এবং রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৯১ শতাংশ বিদ্যালয়ে) পাঠদান চলে দুই শিফ্টে। প্রথম শিফ্ট সকাল ৭:৩০ থেকে দুপুর ১২:০০টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় শিফ্ট দুপুর ১২:৩০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত। একটি গতানুগতিক দুই শিফ্টের বিদ্যালয়ে সরকারি ছুটির দিনগুলো বাদ দিলে বছরে ৬০০ ঘণ্টা পাঠদান করা হয়। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানের সময় উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন। এমনকি দক্ষিন এশীয় প্রতিবেশি দেশ যেমন ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের চাইতেও কম। জানুয়ারি মাসের মধ্যে বিনামূল্যের বই বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার নজির স্থাপন করেছে। মাত্র ৫০ শতাংশ স্কুলে মানচিত্র চক, ডাস্টার এবং ভূগোল-এর ন্যায় প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ আছে, যা সন্তোষজনক নয়।

শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ

প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতে শিক্ষকের অপ্রতুলতা একটি বড় দুর্বল দিক। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ১:৪৮, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ১:৪৬। শিক্ষকদের এক বিরাট অংশই সি-ইন-এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। এদের মধ্যে ২৪ শতাংশ পুরুষ শিক্ষক এবং ৩১ শতাংশ মহিলা শিক্ষক। সাধারণত প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষকদের একাধিক শ্রেণীতে কয়েকটি বিষয়ে পাঠদান করতে হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩০ শতাংশ শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ৩৫ শতাংশ শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। একটি সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা দুই দশক ধরে চালু রয়েছে এবং তা অনুসরণও করা হয়। দেখা যাচ্ছে, ৮০ শতাংশ শিক্ষক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ থেকে উপকৃত হন। প্রাথমিক স্কুলের পরিচালনার ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের মুখ্য এবং নেতৃস্থানীয় ভূমিকা থাকে। শিক্ষকদের সহযোগিতা করা এবং শিক্ষা কার্যক্রম বিদ্যালয়ের পর্যবেক্ষণের জন্য প্রধান শিক্ষকদের প্রতিনিয়ত তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও তেমন কিছু করতে পারেনি। মাত্র ৩৪-৩৮ শতাংশ প্রধান শিক্ষক তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ পেয়েছে। যেহেতু বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক এবং

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয় পরিচালনার সকল ক্ষেত্রেই মূল ভূমিকা পালন করে থাকেন প্রধান শিক্ষক, তাই প্রধান শিক্ষকের মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ অপরিহার্য।

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কাঠামো উন্নত জীবনের সহায়ক না হওয়ায় মেধাবীরা এ পেশায় আসতে আগ্রহী হয় না। উন্নয়ন সহযোগীরা শিক্ষার মানের উন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করলেও এ ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়। সরকারও আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসে না। দিনাজপুরের শিবরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, জগন্নাথ অধিকারী বলেন, "যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের জন্য সম্মানজনক বেতন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষকদের নতুন পে-স্কেল দিতে হবে। বর্তমানে একজন সহকারি শিক্ষক ৪৭০০ টাকা স্কেলে সর্বমোট ৮০০০ টাকা পান। যেখানে ৭০০ টাকা মেডিকেল ভাতা যা বর্তমান বাজারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। গ্রামে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার পরে তদবির করে বদলি নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। আমাদের স্কুলে ২০৪ জন শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৬ জন শিক্ষক রয়েছেন। এসবের সমাধান করতে হবে। বেতন বৃদ্ধি না করলে মেধাবীরা এ পেশায় আসবে না" (সাক্ষাৎকার, জগন্নাথ অধিকারী, ১৪ই এপ্রিল, ২০১৪)। Teach for America-এর ফেলো তাপসী নিলীমা বলেন, "প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন কাঠামো অত্যন্ত নিম্ন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন- কোরিয়া বা ফিনল্যান্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন সর্বাধিক। শিক্ষাগত যোগ্যতাও সব থেকে বেশি চাওয়া হয়। যখন খুব মেধাবী ছেলেমেয়েরা এখানে আসে তখন আউট পুটও ভালো হয়" (সাক্ষাৎকার, তাপসী নিলিমা, ২রা এপ্রিল, ২০১৪)। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের গবেষণা কর্মকর্তা মো. মুরশিদ আক্তার বলেন, "আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক সব থেকে কষ্টসাধ্য কাজ করে, কিন্তু সব থেকে কম মূল্যায়ন পান। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বেতন ২০ হাজার রুপিতে শুরু হয়" (সাক্ষাৎকার, মো: মুরশিদ আক্তার, ২০শে মার্চ, ২০১৪)।

বিদ্যালয় পরিচালনায় কমিউনিটির অংশগ্রহণ

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির (এসএমসি) যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। একটি ভালো বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও পরিচালনা

Dhaka University Institutional Repository

যথাযথভাবে হওয়া উচিত। ছাত্র-শিক্ষক এবং অভিভাবকের ন্যায় প্রধান অংশীদারদের নিয়মিত মিথস্ক্রিয়া বিষয়টিকে অনেক বেশি গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক করে। জবাবদিহিতার প্রশ্নটি মূলত বহুলাংশে সেবাদানকারী হিসেবে শিক্ষকদের ওপরই নির্ভর করে। এক্ষেত্রে ছাত্র ও অভিভাবকরা হচ্ছে মূল সেবা গ্রহণকারী। এই মিথস্ক্রিয়ায় দুটি সহযোগী সংগঠনের ভূমিকা মুখ্য। একটি হচ্ছে- স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি), অন্যটি অভিভাবক-শিক্ষক সংঘ বা পিটিএ। ১১ জন সদস্য নিয়ে এসএমসি গঠিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে এসএমসির সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করেন। অন্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছে ৮ জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ও ২ জন মহিলা সদস্য এবং অভিভাবকদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। এসএমসির মূল কাজ হলো বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার গুণগতমান পর্যবেক্ষণ, ৬ বছর বয়সী সকল শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে অভিভাবকদের উৎসাহিত করা, উপবৃত্তি ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয় নিশ্চিতকরণ এবং বিদ্যালয়ের জরুরি সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান করা। মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এসএমসি'র গঠন একটু ভিন্ন। এক্ষেত্রে এসএমসি ১১-১৩ জন সদস্য বিশিষ্ট হয়ে থাকে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পদাধিকার বলে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তবে মাদ্রাসার এসএমসি'র ভূমিকা ও কার্যক্রম মূলধারার স্কুলগুলোর মতোই। স্থানীয় সংসদ সদস্যকে এসএমসি'র উপদেষ্টা করে কমিটিকে মূলত রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে কমিটির সদস্যদের মাঝে সহযোগিতার চেয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও দলাদলিই বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, যা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিবেশকে ব্যাহত করে। CAMPE-র গবেষণায় দেখা গেছে যে, অযাচিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে এসএমসিগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় না। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি অযাচিতভাবে এমন লোকদের কমিটিতে রাখেন শিক্ষার প্রতি যাদের কোনো আগ্রহ ও উৎসাহ থাকে না অথবা যারা পড়াশুনা করেনি। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও নিজের বন্ধু-বান্ধবদের ভেতর থেকে সদস্য নিয়ে কমিটিকে একপেশে করে ফেলে। ফলে কমিটি প্রধান শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারিতার একটি নতুন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। দেখা গেছে, গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোর এসএমসি'র কার্যক্রম মোটেই সন্তোষজনক নয়। এক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক নির্বাচন ছাড়াও এসএমসি'র কার্যক্রম বিষয়ে এর সদস্যদের প্রশিক্ষণ না থাকাও একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রায় ৪১ শতাংশ এসএমসি তাদের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোর মাত্র ২৫ শতাংশ এসএমসি এ প্রশিক্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর এসএমসি'র ভূমিকা তুলনামূলক খারাপ হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হলো প্রশিক্ষণ না পাওয়া। বেশিরভাগ এসএমসি'র সভা প্রতি চার মাসে একবার অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু এসব সভা থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয় খুবই কম। অন্যদিকে বেশিরভাগ বিদ্যালয়েই পিটিএর সভা হয় অনিয়মিতভাবে। এটা অনেকটা ননফাংশনাল পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। প্রাথমিক শিক্ষার মানকে নিশ্চিত করতে হলে এসএমসি ও পিটিএ-র কর্মকাণ্ডে অংশীদারদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষাখাতে সরকারি ও ব্যক্তিগত ব্যয়

প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতে শিক্ষার্থী পিছু রাষ্ট্রীয় ব্যয় যথেষ্ট নয়। মূলধারার স্কুলগুলোর (সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর ২০০০ সালের বরাদ্দের ব্যাপারে ধারণা পাওয়া যায়। বাংলাদেশ Education Watch ২০০০ সালে দেশব্যাপী প্রতিনিধিত্বকারী প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নমুনা থেকে বরাদ্দের এ পরিমাপটি করেছে। গ্রামাঞ্চলের রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মাথাপিছু বরাদ্দ ৫৩৫ টাকা (US$ 10), শহর এলাকার এবতেদায়ী মাদ্রাসার ক্ষেত্রে তা ১,৮৩৬ টাকা (US$ 35)। এক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে মাথাপিছু বরাদ্দ ১,১০০ টাকা (US$ 20)। রাষ্ট্রীয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। শহরাঞ্চলের এবং গ্রামাঞ্চলের বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে বরাদ্দে পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের বড় একটি অংশ যায় শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন, স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে মাথাপিছু ব্যক্তিগত ব্যয়ও উল্লেখযোগ্য। শহরের এবতেদায়ী মাদ্রাসায় ব্যক্তিগত মাথাপিছু ব্যয় ১০৯৭ টাকা (US$ 20), পল্লী এলাকার বেসরকারি বিদ্যালয়ে তা ৬৪৫ টাকা (US$ 12)। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে মাথাপিছু ব্যয়সমূহ শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে গ্রাম এবং শহর এলাকার বেসরকারি স্কুলগুলোর মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত ও সরকারি ব্যয় উভয় ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ ব্যয় হয় এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষায়। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা বা অন্য কোনোভাবেই এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষাকে বা শিক্ষার মানকে ফলাফলের ভিত্তিতে তুলনা করা সম্ভব হয় না। যদিও এ খাতে মাথাপিছু ব্যয় সর্বোচ্চ।

প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত গোষ্ঠীসমূহ

১৯৯১ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক সরকারি পদক্ষেপ গৃহীত হলেও আজ ২০১৪ সালে ও শিশুদের বিরাট অংশ বিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থান করে। বিভিন্ন কারণ যা শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশুদের উৎসাহ প্রদানে বাধা দেয় তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ার পরেও কেন শিশুদের এক বিরাট অংশ বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে তা বোঝা যাবে বঞ্চিত গোষ্ঠীসমূহের দিকে লক্ষ করলে। তাই এসব বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

যেসব পরিবারের প্রধান মহিলা-

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মহিলা-প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ৬১ লক্ষ। এই ৬১ লক্ষ পরিবারের ২৫ শতাংশ পরিবারকে অতি দরিদ্র্য হিসেবে ধরে নিলে মহিলা-প্রধানযুক্ত হতদরিদ্র্য পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪.৫ লক্ষ। এসব দরিদ্র্য পরিবারের প্রতিটিতে একজন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু আছে বলে ধরে নিলে দরিদ্র্য মহিলা প্রধান বিশিষ্ট পরিবারে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা হতে পারে ১৪.৫ লক্ষ, যাদের অবস্থান ঝুঁকিপূর্ণ বলা যায়। উত্তরের মঙ্গাকবলিত জনপদ, দক্ষিণের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উপকূলবর্তী জনগোষ্ঠীর পুরুষরা কাজের সন্ধানে বৎসরের বেশিরভাগ সময় অনত্র অবস্থানকালে ঐ অঞ্চলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বাচ্চা জন্মদানের কিছুদিন পরে অনেক মহিলাকেই স্বামী পরিত্যাগ করে। এ অবস্থায় ওই পরিবারের প্রধান মহিলা সন্তানদের শিক্ষাদানের সামর্থ্য রাখে না।

হত দরিদ্র্য

সমগ্র জনসংখ্যায় হতদরিদ্র্যের হার তথ্যসূত্রের তারতম্য বিবেচনায় ২০ থেকে ২৭ শতাংশ। সংখ্যায় তা দাঁড়ায় দুই কোটি আশি লক্ষ থেকে তিন কোটি আশি লক্ষ। এই জনসংখ্যার মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের

Dhaka University Institutional Repository

বয়:সীমার অন্তর্গত শিশুর সংখ্যা ৩৯ লক্ষ থেকে ৫৩ লক্ষ। প্রাথমিক পর্যায়ে কখনও বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া শিশুর সংখ্যা ২০০৫ সালে দাঁড়ায় ১৭ লক্ষে। তাহলে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন দাঁড়ায় হতদরিদ্র্য পরিবারের কিছু সংখ্যক শিশু কেন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং অন্যরা কেন ভর্তি হয় না। হতদরিদ্র্যদের যেসব শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, বিদ্যালয়ের জীবন তাদের কেমন কাটে?

কর্মরত শিশু

২০০৯-২০১০ সালের জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ অনুযায়ী ৫-১৭ বছর বয়সসীমার মধ্যে কর্মরত শিশুর সংখ্যা ৩৩ লক্ষ। এদের মধ্যে বিপদজনক শ্রমে নিয়োজিত ছিল ১৩ লক্ষ শিশু। কর্মরত ৩২ লক্ষ শিশুর মধ্যে ১৮ শতাংশ বা ৬ লক্ষ শিশু বিদ্যালয়ে যায়নি। এদের এক-তৃতীয়াংশ আবার কখনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। যদিও শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হয় এবং ১৬ বছরের নিচে কোন শিশুকে কাজে নিয়োজিত করা আইনত অপরাধ, তথাপি অভাবের কারণে শিশুশ্রম কার্যত বন্ধ হয় নাই।

পথশিশু

২০১০ সালে প্রকাশিত বিআইডিএস-এর জরিপ অনুসারে দেশের ১১টি প্রধান শহরে 'পথশিশুর' সংখ্যা ৪.২০ লক্ষ। এদের মধ্যে ১ লক্ষ শিশু কোনো না কোনো সেবা বা আশ্রয় কেন্দ্রের (Drop-in Centers) সঙ্গে যুক্ত ছিল। পথশিশুদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে জরিপের পূর্বাভাস। পথশিশুদের ভাসমান অবস্থান নির্দিষ্টভাবে তাদের সংখ্যা নির্ণয় করতে ব্যর্থ। এই পথশিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক পরিবেশে ধরে রাখতে (পিইডিপি-২) বা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ সফল হয় নাই।

বিশেষ প্রয়োজন বা পরিস্থিতিতে নিপতিত শিশু

দেড় কোটি শিশু কোনো না কোনো রকম প্রতিবন্ধিতার অবস্থায় বাস করছে বলে অনুমান করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুসারে জনসংখ্যার দশ শতাংশ অল্প বিস্তর প্রতিবন্ধী। বর্তমানে প্রায় ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ৪,৫৫,০০০। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আনুমানিক

Dhaka University Institutional Repository

হিসেব অনুসারে এই সংখ্যা আরও বেশি। প্রতিবন্ধীদের বিশ শতাংশেরও কম ছেলেমেয়েরা শিক্ষায় সুযোগের অধিকারী।

জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু শিশু

২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী ক্ষুদ্রজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের উপযোগী শিশুর সংখ্যা ৬৮,৬০০। এদের সকলের পরিস্থিতি একরকম নয়। কিন্তু বেশ বড় সংখ্যক শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যেসব শিশুর মাতৃভাষা বাংলা নয়, শিক্ষণ-শিখনের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসারে শিক্ষার শুরুতে তাদের জন্য নিজস্ব ভাষায় পাঠদান প্রয়োজন। ক্রমশ উচ্চতর শ্রেণীতে মূলধারার ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এরকম ব্যবস্থা এখনও নীতি হিসাবে প্রচলিত হয়নি। জাতিসংঘ ও ভাষাগত সংখ্যালঘু শিশু ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক আর হাতেগোনা দু'একটি ভাষার সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনো ভাষার সাহিত্য বা লিখিত চর্চা দেখা যায় না। এমতাবস্থায় ক্রমশ ওই ভাষাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকার অধিবাসী

হাওর-বাওর, উপকূলীয় এলাকা, দুর্গম পার্বত্য এলাকা ও চর অঞ্চলের অধিবাসীরা শিক্ষাসহ বিভিন্ন সেবার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত। এদের প্রকৃত অবস্থার বিবরণ ও সংখ্যাভিত্তিক পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পশ্চাতপদ এলাকার পরিস্থিতির বিভিন্নতা বিশ্লেষণ করে কার্যকরভাবে সকল শিশুর জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা এখনও হয়নি।

উপসংহার

নব্বইয়ের দশকের শেষার্ধে সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প নামে পরিচিত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচি পরবর্তীতে সম্প্রসারিত হয়ে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচি-১ নামে পরিচিত হয়। এ প্রকল্পে দাতাগোষ্ঠীরা দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর শিশুদের টিফিন প্রদান, শিক্ষা উপকরণের সরবরাহ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য, জীবন দক্ষতা বৃদ্ধিতে সমন্বিত উদ্যোগের অভাব দেখা যায়। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচি-১ এ দাতারা সহায়তা করে নিজ

Dhaka University Institutional Repository

নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী। বিভাগ, অঞ্চল তথা ভৌগলিক বিভক্তিকরণ যেমন ছিল তেমনি সমগ্র কর্মসূচির ফলাফলেও ভিন্নতা দেখা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-১ এর অধীনে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করতে পেরেছিল ৬৪-৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী । আবার শহর অপেক্ষা গ্রামের সুবিধা বঞ্চিত পরিবার, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক (যেমন- সাঁওতাল, গারো, ম্রো এবং ওঁরাও) জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক আওতায় আসেনি। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত কর্মসূচিগুলোর অর্জনসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে বা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-১ (১৯৯৬-২০০৩) এর আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হার বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য পরিমানে লিঙ্গ-সমতা অর্জনে এ কর্মসূচি সফল হয়। তবে পরিমানগত এ বৃদ্ধির (উদাহরণস্বরূপ সামগ্রিক ভর্তির হার ১৯৯৫ সালে যা ছিল ৯৫ শতাংশ তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে ১০০ শতাংশে পৌঁছে) সঙ্গে গুণগত মানের সামঞ্জস্যতা ছিল না। অর্থাৎ 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য, সুযোগ ও সমতা তখনো পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-১ এর পরে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ বাস্তবায়নে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের যৌথ অংশগ্রহণ দেখা যায়।

এ প্রকল্পে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যেসকল পদক্ষেপের প্রস্তাব উত্থাপন ও গ্রহণ করতে দেখা যায় সেসব শিক্ষাব্যবস্থার সুশাসন বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেয়। বিদ্যালয়ে ভর্তি, সেখানকার সুযোগের ব্যবহার ও শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত। পিইডিপি-১ ও পিইডিপি-২ এ উপরোক্ত বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করলেও শিক্ষায় সার্বজনীন প্রবেশের অধিকার এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুযোগবঞ্চিত শিশুদের সুযোগহীনতার পরিস্থিতিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়- (ক) কখনও যারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি; (খ) ভর্তি হয়েও যারা ঝরে পড়ছে; (গ) শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থেকেও যারা শিক্ষায় অংশগ্রহণ না করে প্রকৃত অর্থে সুযোগবঞ্চিত এবং (ঘ) যারা প্রাথমিক পর্যায় শেষ করে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না। পরিসংখ্যানে দেখা যায় শিখন অর্জনের ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক, কারণ যারা ৫ম শ্রেণি শিক্ষা চক্রটি অতিক্রম করেছে তাদের ১০ শতাংশেরও কম শিক্ষার্থী ভাষা, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে। পিইডিপি-২ সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের অভাবকে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করলেও কী কী পদক্ষেপ নিলে সহজে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে তা স্পষ্ট নয়। শিক্ষার গুণগত মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না পেলে মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষা সব শ্রেণির পরিবারের আস্থা অর্জন করতে পারবে না। বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার জবাবদিহিতা ও উৎকর্ষতা খুবই জরুরী।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্বায়ন ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ঃ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার উপর একটি বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়নশীল দেশের বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য প্রদান করে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানকারী উন্নয়ন অংশীদাররা বিশ্বায়নের বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। প্রাথমিক শিক্ষাখাতের উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিগুলোর ফলাফল সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের অর্জনসমূহ কাঠামোগত অন্তরায়ের নিরিখে দেখতে হবে।

৪.১ শিক্ষার অবকাঠামোগত মানোন্নয়ন

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তাদানকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। বার্ষিক বিদ্যালয় জরিপ, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত জরিপ (PPEIS) ও বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এন্ড স্ট্যাটিসটিক্স (BANBEIS)-এর সূত্র থেকে জানা যায় বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বমোট ৭৮,৬৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, যেখানে ৩,৯৫,২৮১ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। এর মধ্যে ৩৭,৬৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিক্ষক সংখ্যা ৩,৩৭,৮৪৫। ৫০০-এর বেশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিও আংশিক বা পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আর এ বিদ্যালয় অথবা কেন্দ্রগুলোতে পড়াশুনা করে প্রধানত পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা। এ কেন্দ্রগুলো শুরুতে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত হলেও কোথাও কোথাও তা ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে। ব্যুরো অব নন ফরমাল এডুকেশন-এর ম্যাপিং স্টাডি অনুসারে (BNFE ২০০৯), ২০০৭ সালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ৫৩,০০০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১.৪ মিলিয়ন শিশু পড়াশোনা করছে। এনজিওদের মধ্যে ব্র্যাক-এর সর্ববৃহৎ উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে। ব্র্যাক প্রায় ৭,৪০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে তাদের কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা দিচ্ছে তাদের সেন্টারের মাধ্যমে অথবা পার্টনার স্থানীয় ছোট ছোট এনজিওর মাধ্যমে।

Reaching out of School Children (ROSC) প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আনন্দ বিদ্যালয় নামে অতিরিক্ত শিখন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। [ROSC (২০১০)] ৭০০,০০০-এর অধিক শিক্ষার্থী ২১,৫০০ শিখন কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করছে। ROSC-এর কেন্দ্রগুলো এনজিওদের

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা পরিচালিত। দাতাগোষ্ঠীর অর্থায়নে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠানে যেসব শিশুরা লেখাপড়া করে তাদের পরিবারগুলো উপকৃত হচ্ছে। মূলত যেসব এলাকায় সরকারি বিদ্যালয়গুলো দূরবর্তী অবস্থানে অবস্থিত সে সকল এলাকায় দাতারা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এছাড়াও সাব ক্লাস্টার পদ্ধতি, মা সমাবেশ, মিনা ভিডিও চিত্রের মাধ্যেমে সচেতনতা তৈরি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, উন্নতমানের টিফিন প্রদান, নতুন বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, পুন:নির্মাণ এবং থানা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ, স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপনের মতো বিষয়গুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেখা যায়, বিগত শতাব্দীর শেষ পাঁচ বছরে যেসব পরিবারের খানা প্রধানের শিক্ষা ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছেছে তাদের দারিদ্র্য কমেছে। এর উল্টো অবস্থা দেখা গেছে সেই সব পরিবারে যেখানে খানা প্রধানের শিক্ষা স্তর ৫ম শ্রেণির নিচে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০১)।

৪.২ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করা

প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্তে সরকারের সহযোগিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই ই আর অনুষদের সাবেক পরিচালক ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিদেশী ও দেশীয় পরামর্শক কাজ করে। তবে, দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের উপরের পদগুলোতে দেখা যায় না। নিম্ন পর্যায়ে চাকুরিরত কিছু শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের দেখা গেলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ থাকে না। ফলে অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো চিহ্নিত হয় না (সাক্ষাৎকার, সিদ্দিকুর রহমান, ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ঢাকা)। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনস্ট্রাক্টর হোসেইন মোহাম্মদ এমরান বলেন, "উন্নত দেশের অনুসরণে শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কারের সুপারিশ সর্বদা এদেশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। যেমন, সৃজনশীল পদ্ধতি, সারা বিশ্বে অল্প কিছু দেশে এ ব্যবস্থা চালু থাকলেও আমরা খুব দ্রুততার সাথে এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।" তিনি আরো বলেন, দাতারা সুশাসনের অভাবকে চিহ্নিত করে কর্মকর্তা ও সাংগঠনিক কাঠামোর সংস্কারের সুপারিশ করে। অথচ বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে দেশীয় শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, সমাজচিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণ একেবারে গৌণ (সাক্ষাৎকার, হাসেইন মোহাম্মদ এমরান, ৯ই আগস্ট, ২০১৪, ঢাকা)। এ প্রসঙ্গে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড.

Dhaka University Institutional Repository

মনজুর আহমদ বলেন, "প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি বড় অংশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা শিক্ষার্থী। অথচ শিক্ষা সংক্রান্ত কোন পাঠ্যক্রম তারা শিক্ষা জীবনে পায় নাই। ফলে শিক্ষকতা পেশায় আসার পরে প্রশিক্ষণ বাবদ অধিক অর্থ ব্যয় করতে হয়। উন্নয়ন সহযোগিরা অভ্যন্তরীণ এ সকল সমস্যা চিহ্নিত না করেই যে সকল পরামর্শ প্রদান করে তা দেশীয় আমলারা গ্রহণ করে। রাষ্ট্রকে দক্ষতার সাথে এসকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে দাতাদের সাথে আলোচনা করতে হবে।" তিনি আরো বলেন, "কর্মরত শিশু, পথশিশু, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু শিশুদের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে না পারলে অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ থেকে এই বিপুল জনগোষ্ঠী বঞ্চিত থাকবে। দেখা যায় এই প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের জন্য দাতারা পরীক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে উৎসাহী। এদের প্রতি যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিক যত্নবান হওয়া বাঞ্চনীয়। সরকারি কাজে প্রজেক্ট প্রক্রিয়ার (পিপি) পদ্ধতি, এগুলোর অনমনীয় প্রয়োগ এবং মানগত লক্ষ্যগুলোকে যথেষ্ট নজর না দিয়ে ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যসমূহের প্রতি একনিষ্ঠ নজর দেওয়া শিক্ষার মান উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে" (সাক্ষাৎকার, মনজুর আহমদ, ০২ জানুয়ারি ২০১৫, ঢাকা)।

আর্থিক সাহায্য গ্রহণ কী জাতিরাষ্ট্রগুলোকে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণে নমনীয় করে? এ সম্পর্কে ডালেম চন্দ্র বর্মন বলেন, "বিশ্বায়ন একটি প্রক্রিয়া। সকল জাতিরাষ্ট্র এতে সম্পৃক্ত হতে পারে কিন্তু সব জাতিরাষ্ট্রের প্রকৃতি এক নয়। ছোট রাষ্ট্রগুলো বড় রাষ্ট্র দ্বারা প্রভাবিত। ছোট রাষ্ট্রগুলো বড় রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে। multistate system-এ রাষ্ট্রগুলোর শক্তির ভিত্তিতে সম্পর্ক তৈরি হয়। বিশ্বের দরিদ্র্যতম ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক থাকে না" (সাক্ষাৎকার, ডালেম চন্দ্র বর্মন, ১৭ই মে, ২০১৪, ঢাকা)।

নির্ভরশীলতার তত্ত্বের ন্যায় বৃহৎ কেন্দ্রগুলোর উপর প্রান্তিক বা স্যাটেলাইটের যে নির্ভরশীলতা সেরূপ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো কেন্দ্রে অবস্থিত শক্তিশালী আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হয়। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর সমস্যা সমাধানে স্বশাসন মূখ্য ভূমিকা পালন করে না। অভ্যন্তরীণ অদক্ষতা, বৃহৎ শক্তির সাহায্য নির্ভরতা দরিদ্র্য রাষ্ট্রের উপর বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রভাব জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণকে দূর্বল করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে জনাব ফেরদৌস হোসেন বলেন, "জাতীয় অর্থনীতি নিজের স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করে কিন্তু বৈশ্বিক অর্থনীতি বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান যেমন: বিশ্বব্যাংক, বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থের প্রতিনিধি। সুতরাং বিশ্বায়ন যত শক্তিশালী হয় জাতিরাষ্ট্র আর্থিক সাহায্য গ্রহণের বিনিময়ে ততবেশি দূর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, সুশাসনের নির্ধারকসমূহ ঐ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে প্রতিষ্ঠানগুলোর গঠন কাঠামোও অগণতান্ত্রিক" (সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস হোসেন, ১৮ই মার্চ ২০১৫, ঢাকা)। অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়সমূহ সংস্কার সাধনের যে প্রস্তাব তা জাতিরাষ্ট্রের উপরে বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া এক ধরনের সিদ্ধান্ত। এ ধরনের সিদ্ধান্ত জাতিরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে একইসাথে দারিদ্র্য বিমোচনে নির্ভরতা তৈরি করে।

৪.৩ দারিদ্র্য বিমোচনে পরনির্ভরতা তৈরি

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-১ ও ২ এ যথাক্রমে ১৬০০ মিলিয়ন ও ১৮১৫ মিলিয়ন বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে সরকার প্রথম প্রকল্পের জন্য শতকরা ৫২ শতাংশ ও দ্বিতীয়টির জন্য শতকরা ৬৪ শতাংশ বহন করে (সূত্র, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, প্রকল্প নকশা-২০০০ ও ২০০৩)। সরকার প্রদত্ত ৬৪ শতাংশ অর্থের মধ্যে এডিবি ও আইডিএ কর্তৃক শতকরা ২.৫ শতাংশ অর্থ বৈদেশিক সাহায্যের আওতায় গ্রহণ করা হয়। দেখা যায় দাতাদের অংশগ্রহণের হার তুলনামূলক কম হলেও বৈদেশিক পরামর্শকদের সম্মানি দেশীয় একজন পরামর্শকের থেকে কয়েকগুণ বেশী। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ এ স্থানীয় পরামর্শকদের সম্মানি বাবদ যেখানে ২৩৩০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল সেখানে বিদেশী পরামর্শকদের সম্মানি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ ধরা হয়েছিল ৯৪৯০ লক্ষ। অর্থাৎ বিনিয়োগকৃত অর্থের অনেকাংশই কনসালটেন্টদের সম্মানি বাবদ চলে যায়। মো: গিয়াস উদ্দিন বলেন, "সরকারের একার পক্ষে শিক্ষাখাতে সামগ্রিক বিনিয়োগ সম্ভব নয়। তবে মনিটরিং যথাযথভাবে করতে পারলে অনেক ক্ষেত্রেই সফল হওয়া সম্ভব। দাতারা একবারে সমস্ত অর্থ ছাড় দেয় না। তারাও মনিটরিং করে। সেক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কি না তা দেখা উচিত। প্রায়শই দেখা যায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শেষ না হলেও শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকার বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে শিক্ষার কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছেন। কিন্তু সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে না অনেকেই"

Dhaka University Institutional Repository

(সাক্ষাৎকার, মো: গিয়াস উদ্দিন, ১১ মে, ২০১৪, ঢাকা)। প্রকল্পের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ধারাবাহিক কাজটিও মাঝ পথে থেমে যায়। এ প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উর্দ্ধতন বিশেষজ্ঞ মো: মুরশিদ আক্তার বলেন, প্রতি দশ বছর অন্তর প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম নীতিমালা ও পাঠ্যসূচির পরিবর্তন করা হয়। ২০০৩ সালে পিইডিপি-১ এর লক্ষ্য অনুসারে পাঠ্যক্রম নীতিমালা ও পাঠ্যসূচির পরিবর্তন করা হয়। নতুন পদ্ধতিতে কিছু বই শিশুদের হাতে দিয়ে শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাবিদদের মতামত মূল্যায়ন করে পুনরায় ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়ার কথা ছিল। আবার শিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ক শিক্ষক সহায়ক নির্দেশনাও এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ শেষ হওয়ার কারণে মূল্যায়ন পরবর্তী সংশোধন ও শিক্ষক সহায়ক নির্দেশনা গাইড তৈরি করা হয় নাই। ফলে ১০ বছর শিক্ষার্থীরা অসংশোধিত বই পড়েছে। অন্যদিকে শিক্ষকরাও পাঠ্য প্রদানের যথাযথ প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন (সাক্ষাৎকার, মো: মুরশিদ আক্তার, ২০ মার্চ, ২০১৪)। আর্থিক নির্ভরশীলতা তৈরি হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথম থেকেই এবং প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায়ে দাতাদের অর্থ ছাড়ের উপরে নির্ভর করতে হয়।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক সহয়তা কৌশলপত্রে বলেছে, "দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের প্রচেষ্টাই হচ্ছে সুশাসন নিশ্চিত করা। পিআরএসপি এমডিজি এর ৮টি লক্ষ্য পূরণে কাজ করে"। এ প্রসঙ্গে ডালেম চন্দ্র বর্মন বলেন, "পিআরএসপি রাষ্ট্রীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্থান দখল করতে পারে না। পিআরএসপি এমডিজি এর ৮টি লক্ষ্য পূরণে কাজ করে কিন্তু আমাদের সামগ্রিক সমস্যা এতে উঠে আসে না। এমডিজি একটি লক্ষ্য হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন করে। অধিকসংখ্যক শিশুর বিদ্যালয় গমনকেই উন্নয়ন সহযোগীরা উৎসাহ দেয় কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার মানের উন্নয়নে সামগ্রিক বিষয়াবলীর পর্যালোচনা হওয়া দরকার" (সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মন, ১৭ই মে ২০১৪)। বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবেলায় দাতারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের অধিক অন্তর্ভুক্তির জন্য বিস্কুট প্রদান, খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করে। বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেলেও উপরের শ্রেণিতে ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ দারিদ্র্যের ন্যায় ব্যাপক বিষয়টির সমাধান না করে বিদ্যালয়ে টিফিন প্রদানের মতো সাময়িক ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা গ্রহণে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে উৎসাহী করতে পারে না। এটি চিরস্থায়ী কোন পদক্ষেপও নয়। দরিদ্র্য শিক্ষার্থী উপরের শ্রেণিতে টিকে থাকার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে জীবন সংগ্রামে পরিবারের সহায়ক হয়।

দরিদ্র্য শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আকর্ষণে বিদ্যালয়ে শিশুদের আসতে দেখা যায়। আবার উল্টো চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ও ফলাফলের উপরে বিদ্যালয়গুলোর রেজিস্ট্রেশন নির্ভর করে, বিধায় শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের অধিক উপস্থিতি দেখিয়ে উপবৃত্তি গ্রহণ করে। শহরের ফলাফলের তুলনায় গ্রামীণ বিদ্যালয়ের ফলাফল খারাপ হওয়ায় প্রায়শই ৫ম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষায় দুর্নীতি দেখা যায়। প্রান্তিক পেশা ও শ্রমজীবি পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতা শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উৎসাহ যোগাতে পারে না। তাই দারিদ্র্যকে মোকাবিলার জন্য সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্র স্বয়ং ব্যবস্থা গ্রহণ করে সচেতনতা বৃদ্ধি না করতে পারলে ক্রমাগত দারিদ্র্য বিমোচনের অপরাপর কৌশলের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রেও দারিদ্র্য বিমোচনের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

৪.৪ স্থানীয় জ্ঞানের বাস্তবতাকে গুরুত্ব না দেওয়া

উন্নয়ন সহযোগিরা প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারকে সহায়তা করে অর্থ ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান কিছু অভ্যন্তরীণ সমস্যা সম্পর্কে তারা আদৌ উৎসাহী থাকেন না। শিক্ষকদের বেতন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষাবিদদের সম্পৃক্ততা, রাজনৈতিক প্রভাব, আমলাদের অদক্ষতা এদের মধ্যে অন্যতম। গবেষণায় সাক্ষাৎকারদাতা প্রায় প্রত্যেকেই শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। রংপুরের নেক মাহমুদ সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক লতা মজুমদার বলেন, "প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত পরিবর্তনে শিক্ষকদের বেতন কাঠামোয় পরিবর্তন আনতে হবে। ড. কুদরতি খুদা শিক্ষা কমিশন সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা উচিত। দেখা যায় এসএসসি পাস ও মাষ্টার্স পাস শিক্ষকদের একই বেতন যা মেধাবিদদের অনুৎসাহিত করে। শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল করা উচিত" (সাক্ষাৎকার, লতা মজুমদার, ১৯ এপ্রিল ২০১৪)। দেশীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান দূর্বলতা কোনটি এর উত্তরে Teach for America এর ফেলো তাপসী নিলীমা বলেন, "প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন কাঠামো অত্যন্ত নিম্ন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন কোরিয়া বা

Dhaka University Institutional Repository

ফিনল্যান্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন সর্বাধিক। শিক্ষাগত যোগ্যতাও সব থেকে বেশী চাওয়া হয়। যখন খুব মেধাবী ছেলে-মেয়েরা এখানে আসে তখন এর ফলাফলও ভালো হয়। অপর একটি বিষয় হচ্ছে আমরা লেখাপড়া শুধু পাস করার জন্য করে থাকি, কিন্তু মনে রাখতে হবে এর মধ্যে দিয়ে শিশুদের বিভিন্ন বিকাশগুলো পরবর্তী জীবনে রাষ্ট্রের কাজে সম্পৃক্ত" (সাক্ষাৎকার, তাপসী নিলীমা, ২রা এপ্রিল, ২০১৪)। কিন্তু উন্নয়ন সহযোগি দাতারা শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য কখনো পরামর্শ প্রদান করে না। প্রশিক্ষণ প্রদান বা শিশুদের পরিমাণগত অংশগ্রহণের জন্য যতটা উৎসাহ প্রদান করে সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নির্ধারিত বেতনে উন্নত জীবনযাত্রার সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে শিক্ষা প্রদানে ততটা উৎসাহী হন না।

বর্তমানে পাঠ্যসূচিতে সৃজনশীল পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোর আলোকে এটি প্রচলিত হয়েছে। এতে শিক্ষার্থী যেকোন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। কোচিং সেন্টার ও নোটবই এর উপর নির্ভরতা কমাতে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও দেখা গেছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন না করেই পাঠদান শুরু করেছে বিদ্যালয়গুলো। শুধুমাত্র ভালো ফলাফল করার জন্য বছরের শুরু থেকেই টিউশনি নির্ভর হচ্ছে অভিভাবকরা। বাজারে গাইড বই বিক্রি হচ্ছে অসংখ্য। বিদেশী পরামর্শকরা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত থাকেন না। ভালো ফলাফল আর শিক্ষণ দক্ষতার মধ্যে বিস্তর তফাৎ সে বিষয়টি বিবেচনা করা হয় না ।

গবেষণায় দেখা যায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ, শিক্ষকদের অপর্যাপ্ত বেতন, দারিদ্র্যতা, প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতা, যথাযথ মনিটরিং-এর অভাব সর্বপরি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত কিছু শর্ত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে বাস্তবায়নে বিলম্বিত করছে। বিশ্বায়নের রূপান্তরবাদীরা বিশ্বায়নের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি সেগুলোর সফলতা জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সামর্থ্যের উপরে নির্ভর করে বলে মতামত দেন। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রাথমিক শিক্ষায় অন্যতম একটি সমস্যা। এ ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উর্দ্ধতন বিশেষজ্ঞ, মো: গিয়াস উদ্দিন বলেন, "শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষাবিদদের সম্পৃক্ত করতে হবে। সরকার বদলে গেলে শিক্ষার পাঠ্যসূচি পরিবর্তন হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নুতন মন্ত্রি, শিক্ষা সচিব এলে নুতন করে সমস্ত তথ্য উপস্থাপন করতে হয়। সমন্বয়সাধনে

Dhaka University Institutional Repository

সময় নষ্ট হয়। এ ধরনের জটিলতা দূর করতে হবে। শিক্ষা সংক্রান্ত যেকোন সিদ্ধান্ত শিক্ষাবিদদের অংশগ্রহণের মাধ্যেমে নিতে হবে (সাক্ষাৎকার, মো: গিয়াস উদ্দিন, ১১ই মে, ২০১৪)।"

উপসংহার

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নব্বইয়ের দশকে শুরু হওয়া অগ্রগতি ২০০৪-২০০৫ সালের দিকে এসে থমকে দিয়েছিল। পরবর্তীতে ভর্তি হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫ম শ্রেণী সমাপনী পরিক্ষায় ভালো ফলাফল দেখা গেলেও দক্ষতার মান নিয়ে জনসমাজে প্রশ্ন রয়েছে। প্রকল্পরূপে বরাদ্দকৃত অর্থ সব শ্রেণীর শিশুদের অন্তর্ভূক্ত করতে পারে নাই। শিক্ষকদের বেতন উন্নত জীবন মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। রাজনৈতিক পৃষ্টপোষকতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দাতাগোষ্ঠীর সমন্বিত উদ্যোগের যথাযথ মনিটরিং-এর অভাব গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। বিশ্বব্যাংক সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহের একটি লক্ষ্য হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি বিবেচনা করে। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ও শিক্ষাচক্র শেষে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ – এ দুটি বিষয়ের উপর তাই জোর দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন কী শুধু এ দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? রেজিষ্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫০ জন শিক্ষার্থী না থাকলে রেজিষ্ট্রেশন বাতিল হবার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে অনেক রেজিষ্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তাদের শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়িয়ে দেখায়। শিক্ষা একটি টেকনিক্যাল বিষয়। আমরা সেভাবে এর গুরুত্ব দেই না। বাংলাদেশ সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা বলা হলেও উভয় পক্ষই শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি এড়িয়ে গেছে। দেশীয় বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা দাতাগোষ্ঠীর সাথে আলোচনায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। নিজেদের চাহিদা যথাযথভাবে তুলে ধরতে না পারা আমাদের ব্যর্থতা।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

সমসাময়িক বিশ্বায়নের ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল ও সাহায্য নির্ভর জাতিরাষ্ট্রগুলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণের বহি:স্থ শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশ্বায়নকেন্দ্রিক তিন ধরনের বিতর্কে এই প্রভাবগুলোর পক্ষে, বিপক্ষে এবং উভয় মতবাদের সমন্বিত বিশ্লেষণ আলোচ্য গবেষণায় দেখা যায়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র স্বীকৃত নাগরিকের পাঁচটি মৌলিক অধিকার পূরণে রাষ্ট্রের

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা এই মূলনীতির আলোকে বাস্তবায়িত হওয়ার কথা। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ রাষ্ট্রকে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণে দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শের উপর নির্ভরশীল করে। বাংলাদেশের শাসন সংক্রান্ত বিষয়াবলীতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত সুশাসন বিষয়টির ধারণা প্রাপ্তি ঘটে '৮০-এর দশকে বিভিন্ন উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে। এ গবেষণায় সার্বভৌমত্বের উপরে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাব বিশ্লেষণে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের সিদ্ধান্ত তথা সার্বভৌমত্ব ধারাবাহিকভাবে দাতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। উক্ত গবেষণায় বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণকে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিশ্বায়নের রূপান্তরবাদী তত্ত্বের সমর্থকরা যেমন মনে করেন, জাতিরাষ্ট্র সাহায্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা, জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয়ের মাধ্যমে নিজস্ব সামর্থ্যের আলোকে বিশ্বায়নের সুযোগকে গ্রহণ করতে পারে। তেমনি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের নিজস্ব নীতিমালা, দেশীয় শিক্ষাবিদদের অংশগ্রহণ ও আমলাদের দক্ষতার দ্বারা সমস্যাসমূহ সমাধানে দাতাদের সাথে পারস্পারিক যোগাযোগ তৈরি করতে পারে। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলো ঋণ প্রদানের পশ্চাতে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যে সুযোগ লাভ করে তা রাষ্ট্রের সক্ষমতাকে যেন নির্ভরশীলতায় পরিণত না করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব সব সময় নেতিবাচক নয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোর ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল ও উন্নয়ন সহযোগিদের ভূমিকা বাস্তব পরিস্থিতির পুরোপুরি প্রতিফলন নয়।

রূপান্তরবাদী তত্ত্বের আলোকে গবেষণায় গৃহীত অনুমানগুলো "বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় জাতিরাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলো ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করেছে; জাতিরাষ্ট্র এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে অভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও দক্ষতার বিনিময় দ্বারা নিজস্ব সামর্থ্য বৃদ্ধির সুযোগকে গ্রহণ করতে পারে" এবং অনুমানটির অপর অংশ "নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের ফলে শিক্ষার অধিকার পণ্যে রূপান্তরিত হয় যা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়নি"। পর্যালোচনার মাধ্যমে ব্যাখা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের মধ্যে বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-১ (১৯৯৫-২০০০)-এ বেশকিছু সফলতা দেখা যায়। যেমন, প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হার বৃদ্ধি, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লিঙ্গ-সমতা অর্জন ইত্যাদি। তবে পরিমাণগত এ বৃদ্ধির (উদাহরণস্বরূপ সামগ্রিক ভর্তির হার বা ১৯৯৫ সালে যা ছিল ৯৫ শতাংশ তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে ১০০ শতাংশে পৌঁছেছে) সাথে গুণগত মানের সামঞ্জস্যতা ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-১ এর অধীনে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করতে পেরেছিল ৬৪-৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী। আবার এ শিখন অর্জনের ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক কারণ যারা চক্রটি অতিক্রম করেছে তাদের ১০ শতাংশেরও কম শিক্ষার্থী ইংরেজী, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে। শহর অপেক্ষা গ্রামের সুবিধা বঞ্চিত পরিবারের শহরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক (যেমন- সাঁওতাল, গারো, ম্রো এবং ওঁরাও) উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক আওতায় আসেনি। অর্থাৎ 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রমের একটি প্রধানতম লক্ষ্য সুযোগ ও সমতা তখনো পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয়নি।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতে গৃহীত মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বা কর্মসূচি পিইডিপি-২ (আর্থিক বছর ২০০৩-২০০৯) এর প্রণয়ন কাজে দেশীয় পরামর্শকরা দাতাগোষ্ঠীর সহযোগি হিসেবে কাজ করেছে। ফলে পিইডিপি-২ এর পরিকল্পনা ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) নির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট ছিল। পিইডিপি-২ এর পরিকল্পনা দলিলগুলো ভালো টেকনিক্যাল ডকুমেন্ট যেখানে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বাজেট খাত, বাস্তবায়নের বিভিন্ন পথ/কৌশল এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতো সময়, শ্রম ও সম্পদ ব্যয় করার পরও বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতে নতুন ধরনের কোনো উন্নয়ন হয় নাই। পিইডিপি-২ এর লক্ষ্যসমূহে উৎকর্ষতা থাকা সত্ত্বেও এটি প্রধানত দাতাগোষ্ঠী পরিচালিত এবং ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটি পরিকল্পনা। যেখানে দেশীয় প্রধান অংশীদারদের যথা: শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকগোষ্ঠী, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজ চিন্তাবিদদের অংশগ্রহণ ছিল একেবারে গৌণ। পলিটিক্যাল ইকোনমির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, এর প্রধান কারণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়-সামাজিক কাঠামোগত সমস্যাতেই নিহিত। পিইডিপি-২ পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের আমলে প্রণয়নকৃত (১৯৯৬-২০০৩)। পিইডিপি-২ রাজনীতিবিদ ও আমলাদের তত্ত্বাবধান/অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের মোট বরাদ্দের ১৪ শতাংশ ব্যয় হয় (জিডিপির ১ শতাংশ মাত্র) প্রাথমিক শিক্ষাখাতে। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রীয় বাজেটে অপর্যাপ্ত (শিক্ষার্থী পিছু ২০-২৫ মার্কিন ডলার) বরাদ্দ থাকায় দাতাগোষ্ঠী বাংলাদেশের শিক্ষাখাতের উন্নয়নে ঋণ/মঞ্জুরি অপরিহার্য বলে মনে করে। এ সুযোগে দাতারা বিভিন্ন শর্ত যেমন: পরামর্শকদের বেতন ভাতা, কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা ইত্যাদি চাপিয়ে দেয়। বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ, আমলা ও ব্যবসায়ী এ ব্যবস্থা তাঁদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ হাসিলের জন্য সুবিধাজনক মনে করে। ফলস্বরূপ চাপিয়ে দেওয়া নীতিই আমাদের জাতীয় জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠে। সে সব চাপিয়ে দেওয়া নীতিকে গ্রহণ করার পাশাপাশি আমরা সে অনুযায়ী কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করে থাকি (আলম, ভূঁইয়া ও খান, ২০০৮ : ৪৮)।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বড় পরিকল্পনা বা কর্মসূচি নেওয়া সত্ত্বেও গত ৩-৪ বছরে এ উপখাতে তেমন সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়নি। নীট নিবন্ধনের হার থেকে সহজে প্রতীয়মান হয় যে, প্রায় ১৩-১৬ শতাংশ বিদ্যালয় গমনোপযোগী (৬-১০ বছরের) শিশু বিদ্যালয়ের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৯০) চালু হওয়ার ১৮ বছর পর এই অবস্থা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। একদিকে যেমন নীট নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না, তেমনি অন্যদিকে যেসব ছাত্রছাত্রী নিবন্ধিত হচ্ছে তাদের এক বিরাট অংশ প্রাথমিক শিক্ষা চক্র শেষ করার আগেই ঝরে পড়ছে। এছাড়া যারা (নিবন্ধনকৃত শিশুর ৬৭-৭০ শতাংশ) সমাপনী শ্রেণী পর্যন্ত যাচ্ছে তাদের শিখন-যোগ্যতা নিয়েও রয়েছে নানা প্রশ্ন। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নব্বইয়ের দশকে শুরু হওয়া অগ্রগতি ২০০৪-২০০৫ সালের দিকে এসে থমকে গেছে। ভর্তির সংখ্যা যেমন কমে গেছে তেমনি গ্রাম ও শহর অস্বচ্ছলের দরিদ্র্য পরিবারের শিশুদের ভর্তির হার এবং এসব শিশুকে স্কুলে ধরে রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি। শিক্ষকদের প্রেষণা, দক্ষতা এবং জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে এখনো অনেক কাজ বাকি রয়েছে। সার্বিক মান বিচারে আমরা পিছিয়ে রয়েছি বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। আশির দশকের শিক্ষার মান আর আজকের শিক্ষার মানে বড় ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এদেশে ৫-৬ বছরের একটি শিশু আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতো। কিন্তু বর্তমানে উন্নত বিশ্বের মতো প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

Dhaka University Institutional Repository

শিশুদের শিক্ষা শুরু হচ্ছে ৩-৪ বছরের মাথায়। ইংরেজি মাধ্যমের প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করে। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা চাকুরির বাজারে অধিক জাতিক কোম্পানির অধিক বেতনের সুযোগ ও আন্তর্জাতিকভাবে চাকুরির জন্য প্রতিযোগিতায় গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। ফলে দেশে এই মাধ্যমে লেখাপড়ায় আগ্রহী অভিভাবকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বেতনের আধিক্য সকল পরিবারের পক্ষে সংকুলান করা সম্ভব নয়। এজন্য ইংলিশ ভার্সন নামের আরেক ধরনের ব্যবস্থাও বেশ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। যেখানে শিক্ষার্থিরা খুব কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে। অন্যদিকে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ ও অবৈতনিক ব্যবস্থা থাকলেও অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারের শিশুদের এ সকল বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ দেখা যায় না। এছাড়াও রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষার এই বহুধা বিভক্তি রাষ্ট্রে শ্রেণি বিভাজিত নাগরিক তৈরি করছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্মানের দিক থেকে পার্থক্য নিয়ে বেড়ে উঠা ভবিষ্যত প্রজন্ম দেশের মধ্যে থেকেই ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যসূচী ও মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে বেড়ে উঠছে। উচ্চ শিক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হবার আগ্রহ সবথেকে বেশি দেখা যায়। বিজ্ঞান শিক্ষায় ক্রমাগত শিক্ষার্থি সংখ্যার অনাগ্রহ এবং মানবিক শিক্ষায় সবথেকে কম মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থির অনুপ্রবেশ শিক্ষার উন্নয়নে ও সম্প্রসারণে ভারসাম্য নষ্ট করছে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জনের থেকে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করছে মূলত এই বাজারমুখী শিক্ষা।

সুপারিশসমূহ

এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে বিশ্বায়নের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন নীতিমালা জাতিরাষ্ট্রগুলোর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত। রাষ্ট্রীয় শক্তিমত্তার উপর এই ফলাফলগুলো নির্ভর করে। বিশ্বায়নের রূপান্তরবাদীদের মতে, ছোট দেশগুলো অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠে বিশ্বায়নের সুফল ভোগ করতে পারে। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে গুরত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে জনগণের প্রতিনিধি যারা তাদেরই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে জনগণের মতামত ও জনমত বিবেচনায় আনা উচিত। আবার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলো বহি:বিশ্বে বাংলাদেশকে সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব সত্য রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিবর্গের কাছে তুলে ধরে। শিক্ষা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত অধিকার হওয়ায় সরকারকে এর উন্নয়নে বাস্তবতার আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

যেমন-

১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা উন্নয়ন সহযোগিদের অংশগ্রহণকে দেশীয় শিক্ষাবিদ, পরামর্শকদের সাথে সমন্বিত করা।

২) প্রাথমিক শিক্ষার মানের উন্নয়নে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা।

৩) চরাঞ্চল, দারিদ্র্য-পীড়িত অঞ্চল, হাওর এলাকা, পথশিশু, নদী ভাঙ্গন এলাকা, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী প্রভৃতির সকল শিশুকে সমানভাবে প্রাথিমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় আনা।

৪) আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা।

৫) রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।

৬) বিদ্যালয় পর্যায়ে শিশুদের শিক্ষা অর্জনে বিরূপ প্রভাব রাখে এমন সুযোগহীনতা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ।

এ সংক্রান্ত উদ্যোগের ক্ষেত্র হবে প্রতিটি বিদ্যালয়। এখানেই শিক্ষা কর্তৃপক্ষ শিশু, শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে সরাসরি পৌঁছাতে পারবে এবং বিশেষ পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। এই পদক্ষেপের অংশ হতে পারে নিম্নরূপ।

- প্রতি বিদ্যালয়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সনাক্ত করা এবং তাদের প্রকৃত অবস্থা বোঝার চেষ্টা করা।
- প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের ও পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে পাঠসংক্রান্ত সহায়তা দানের ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষা উপকরণ, খাতা, পেন্সিল, ওয়ার্ক বুক ইত্যাদি বিতরণ করা এবং এজন্য দরিদ্র্য পরিবারগুলোকে সব রকম ব্যয় থেকে অব্যাহতি দেওয়া।
- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অভিভাকদের সঙ্গে শিক্ষকদের সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং প্রতি শিক্ষককে এজন্য নির্দিষ্টসংখ্যক শিশুর জন্য বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

- স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক, ইউনিয়ন পরিষদ ও সমাজের প্রতিনিধিদের বিদ্যালয়ে যে বিশেষ উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে সম্বন্ধে অবহিত করা।
- বিশেষ উদ্যোগের জন্য বিদ্যালয় পর্যায়ে অর্থের সংস্থান করা (উপবৃত্তির অর্থ এই উদ্দেশ্য ব্যবহারে অপেক্ষাকৃত ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে)।

শিক্ষার গুণগত মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না পেলে ধনী-দরিদ্র্য নির্বিশেষে সব শ্রেণীর পরিবার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি ক্রমশ আস্থা হারিয়ে ফেলবে। এজন্য গুণগত মানসম্পন্ন ও জবাবদিহিতামূলক মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির জন্য এখন খুবই জরুরি। এ সকল সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রধান উপায় হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা-প্রশাসনের নিচের পর্যায়ে, যথাক্রমে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের কাজ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছে ছেড়ে দেওয়া। পিইডিপি-২ এর রূপরেখায় এটি বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই-র) বিদ্যমান প্রশাসন কাঠামোকে আরও জনসম্পৃক্ত করা দরকার, যাতে সেগুলো স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে।

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সঙ্গে শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএগুলোকে জবাবদিহি হতে হবে। এখন যে মাত্রায় এসএমসি ও পিটিএগুলো কাজ করছে তা সন্তোষজনক নয়। তাই শিক্ষক ও অভিভাবকদের মিথস্ক্রিয়ায় আরও উন্নত ও সক্রিয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া জরুরি। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে ভিন্ন ব্যবস্থা নিতে হবে। সুষ্ঠু তদারকি এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা গেলে একদিকে যেমন অতি গরিব ছেলে-মেয়েরা মূলধারার স্কুলে নিবন্ধন করবে, তেমনি অন্যদিকে যারা নিবন্ধন করছে তারা গুণগত শিক্ষা প্রাপ্তির ব্যাপারে নিশ্চিত হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য তৈরি পিইডিপি'র মতো কর্মসূচির বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততা, কর্তৃপক্ষের মনিটরিং, সরকারী আমলাদের দক্ষতা, শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণ ও যথাযথ মূল্যায়নের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রসমূহ

আকাশ, এম এম (২০০২), *বিশ্বায়নে বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকা, বিজ্ঞান চেতনা-বিশেষ সংখ্যা।

আলম, ভূঁইয়া ও খান (২০০৮), *মধ্যমেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ঢাকা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

আলম ও মল্লিক (২০০৭), *বাংলাদেশের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জন*, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ঢাকা বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

ইসলাম, এস আমিনুল (২০০৬), *উন্নয়ন : চিন্তার পালাবদল*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ।

তুহিন, আরিফুজ্জামান (২০১২), *বিশ্বব্যাংকের আগ্রাসন : উচ্চশিক্ষা চলে যাচ্ছে বিদেশী ব্যাংকের হাতে*, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা, চিত্রকল্প।

ভট্টাচার্য, দেবপ্রিয়, আহমেদ, সাঈদ (২০০৬), *বাংলাদেশের দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র (পি আর এস পি) মূল প্রতিবাদ্য ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ*, ঢাকা, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ।

মুহাম্মদ, আনু (২০০১), *ক্রান্তিকালের বিশ্ব অর্থনীতি ও উন্নয়ন সাম্রাজ্য*, ঢাকা, মীরা প্রকাশন।

মুহাম্মদ, আনু (২০১১), *বিশ্ববায়নের বৈপরীত্য*, ঢাকা, শ্রাবনী প্রকাশনী।

মোস্তফা, কল্লোল, রুবাইয়াৎ, মাহাবুব, শান্তি, অনুপম সৈকত (২০১২), *জাতীয় সম্পদ, বহুজাতিক পুঁজি মালিকানার তর্ক*, ঢাকা, সংহতি প্রকাশন।

সিং কাভালজিৎ (২০০৫), *বিশ্বায়ন কিছু অমিমাংসিত প্রশ্ন*, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

সোবহান, রেহমান (১৯৯৩), *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, ঢাকা, বিআইডিএস।

Dhaka University Institutional Repository

হক, ম. ইনামুল (২০১২), *বাংলাদেশের জল ও জ্বালানি*, ঢাকা, সংহতি প্রকাশন।

হোসেন, ফেরদৌস (২০০৬), *গ্যাট থেকে ডব্লিওটিও*, ঢাকা, পলল প্রকাশনী।

ক্ষেত্র, গুপ্ত (২০০২), *লোক সংস্কৃতি গবেষণা*, কলকাতা।

Ahmed, Imtiaz (2001), "Globalization, State and Political Process in South Asia", in Khan, Abdur Rob (ed.) 2003, *Globalization and Non-Traditional Security in South Asia*, Colombo and Dhaka: Regional Centre for Strategic Studies; Academic Press and Publishers Limited.

Ahmed, Momtaz Uddin (200l), "Globalisation and Development Challenges," *The Financial Express* 2002.

Ahmed, Sadia and Zaidi, Sattar (2004), "Impact of trade liberalization: Looking at the evidence", *Economic and Political Weekly*.

Amin's (1997), *Capitalism in the age of globalization*, London: Zed press.

Asaf, Samir (2001), "Perspectives on Global Society", *Holiday*.

Asgar, Dr M. A. (2001), "Science and Technology of 21st Century: The Role of Universities", *The Bangladesh Observer*.

Austine, Jhon (1873), *Lectures on Jurisprudence : The Philosophy of Positive Law*, London, Albemarle Street.

Bakht, Zaid (2001), "Thirty Years of Industrialization of Bangladesh", *in Bangladesh in Thirty Years*, The Asiatic Society of Bangladesh (mimeo. chapter in a forthcoming volume).

Beabout, Gregory R. (2000), "The World at 2000", *World & I*, Vol. 15, No. 10.

Berger, Samuel R. (2000), "A Foreign Policy for the Global Age", *Foreign Affairs*, Vol. 79, No. 6. "Beyond The Hague" (2000), The Economist (London).

Bhardwaj, Arjun and Hossain (2001), *Globalization and Multinational Corporations in South Asia: Towards Building a Partnership for Sustainable Development*, Colombo: Regional Centre for Strategic Studies, RCSS Policy Studies.

Binder, Leonard (1964), *The Ideological Revolution in the Middle East*, New York: John Wiley and Sons.

Bodin, Jean (1576), *Six books on the Republic*, Cambridge University Press.

Bonsignore, Michael R. (2000), "Global Connectivity", *Executive Excellence*, Vol. 17, No. 10.

Dhaka University Institutional Repository

Brecher, Michael (1963), The Subordinate System of Southern Asia", *World Politics*, 15.

Burlatski, F. M. (1973-74), "System Analysis of World Politics and the Planning of Peace", *Sovetskoe gosudarstvo: pravo, No. 8 (1973), Translated in International Journal of Politics*, III. No. 4.

Carlson, Don (2000), "The Old Economy is the New Economy", *Business Week*, No. 3707.

Cerny, Philip G (1997), "*Paradoxes of the Competition State: The Dynamics of Political Globalization*." Government and Opposition 32(2): 251-274.

Chomsky, Noam (1999), *Profit Over People : Neoliberalism and Global Order*, Madhyam Books, New Delhi.

Choudhury, Ishfaq Ilahi (2000), "Conventional Security Threats to Bangladesh in the 21st Century: The Role of the Armed Forces", in Humaun Kabir (ed.), *National Security of Bangladesh*.

Dahl, R. A. (1989), *Democracy and its critics*, New heaven, Yale University Press.

Dicker, P. (1998), *Global shift (3rd edn)*, London, chaps.

"Economic Liberalization and macro-economic Stability in Bangladesh: An Overview (2004)" Paper presented at a National Workshop *on Impact of Globalization on Bangladesh,* Dhaka. organized by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies.

Fukuyama, F. (1994), *The end of history and the last man*, New York, The Free Press.

Garner (1951), *Political Science and Government*, Calcutta, World Press.

Garner (1967), *The State in Theory and Practice*.

Garner (1999), "Governance and the international development community: making sense of the Bangladesh experience", *Contemporary South Asia*, 8 (3).

Genschel and Seelkopf (2015), "*The Competition State The Modern State in a Global Economy*", Oxford University Press.

Held, David, McGrew Anthony, Goldblah David and Peraton Jonathan (1999), *Global Transfarmations Politics, Economics and culture*, Stamford University Press.

Huntington, eds., (1991), *The Third, Wave, and Democratization in the late Twentieth Century Norman oK*: University of Oklahoma Press.

Kalam, Abul (2002), *Globalization and Bangladesh in the New Century*, Dhaka, Palok Publishers.

Laski, J. H. (1967), *The State in Theory and Practice,* Oxford University Press.

Ohmae, Kenichi (1990), *The Borderless World*, New York, Haper Collins.

Dhaka University Institutional Repository

Opello, J. W. & S. Rosow (1999), *The Nation State and Global Order: A Historical Introduction to Contemporary Politics*, Doulder; Co: Lynre Rienner.

Pennock and Smith (1964), *Political Science*, UK, Macmillan.

Petras, James and Henry Veltmeyer (2001), *Globalization Unmasked : Imperialism in the 21st Centure*, Madhyam Books, New Delhi.

Quibria, M. G. (ed.) (1997), *The Bangladesh Economy in Transition*, Dhaka, UPL.

Ronald Robertson (1992), *Understanding Cultural Globalization*, UK, Cambridge.

Sen, Amartya (2002), *Behaviour and the Concept of Preterence*, America Prospect, New York, Oxford University Press.

Steven P. McGiffen (2002), *The Pocket Essential Globalization*, Trafalgar Square Publishing.

Stiglits, Joseph (2006), *Making Globalization Work*, Aller Lane an Implicit of Penguin Books.

World Bank (2002), *Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World Economy*, New York, Oxford University Press.

রিপোর্ট ঃ

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-২০০৭।

অর্থ মন্ত্রনালয় (২০০৭), বাংলাদেশ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০০০), প্রাথমিক শিক্ষা উপাত্ত।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০০১), প্রাথমিক শিক্ষা উপাত্ত।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০০৫), প্রাথমিক শিক্ষা উপাত্ত।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০০৭), প্রাথমিক শিক্ষা উপাত্ত।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০১০), প্রাথমিক শিক্ষা উপাত্ত।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০১২), প্রাথমিক শিক্ষা উপাত্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বক্স, মিশেল (অক্টোবর, ২০০৮), দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা।

বিশ্বব্যাংক (২০১০), *বাংলাদেশ সহায়তা কৌশলপত্র ২০১১-২১০১৪ সার সংক্ষেপ*।

A Synthesis Report (1999), *WTO and the Globalization of Food Insecurity*, Authors: Mark Ritchie, Tim Lang, Peter Rosset, Miguel Altieri, Steven Shrybman, Al Krebs, Vandana Shiva, Helena Norberg-Hodge, New Delhi: The International Forum on Food and Agriculture (IFA).

Our Global Neighborhood, (1995), *Report of the commission of global governance*, New Yourk, Oxford University Press.

World Bank, (1994), "Final Financial Flower to Developing Countries, Washingtons", *World Bank.*

World Bank, (1996), "World Debt Tables: External, Finance for Developing Countries, Washington", *World Bank.*

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

আলোচ্য গবেষণাটিতে গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী পূরণে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্যভিত্তিক পূর্ব পরীক্ষিত প্রশ্নমালার আলোকে সাধারণ জনগণের মতামত জরিপের মাধ্যমে গবেষণার লক্ষ্য তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে।

সাধারণ মতামত জরিপের জন্য বিভিন্ন স্তরের ২৫ জন উত্তরদাতা থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের ২টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা :

(১) বিষয় বিশেষজ্ঞ – ১০ জন

(২) শিক্ষক ও আমলা – ১৫ জন

(ক) সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের – ৭ জন শিক্ষক

(খ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর ও জাতীয় পাঠ্যক্রম ও

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের – ৮ জন গবেষক ও আমলা।

বিশ্বায়ন এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে বিশ্বব্যাংকের শাসনসংক্রান্ত শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে উপরোক্ত তিন ধরনের নাগরিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পেশা, অবস্থান, লিঙ্গ, বয়স, প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যদার ব্যক্তিকে সাক্ষাতকার ও প্রশ্নমালার আবদ্ধ উন্মুক্ত পদ্ধতিতে মতামত সংগ্রহ করেছি। পুরো প্রশ্নের উত্তরকে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

গবেষণার প্রশ্ন :

১. এর মাধ্যমে সাক্ষাতকারের আলোকে বিবৃতিমূলক উত্তরমালা নিয়ে সাজানো অংশ তুলে ধরা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য প্রদান করে। প্রথমিক শিক্ষা তেমনি একটি খাত। সুশাসনের আলোকে শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিগুলো প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কতটা কার্যকর এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বে কিরূপ প্রভাব ফেলে সেই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে নিম্নোক্ত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে।

পরিশিষ্ট-২

বিশ্বায়ন এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ঃ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাসন সংক্রান্ত শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

বিষয় বিশেষজ্ঞ

গ্রুপ : 'ক'

সাক্ষাতকারদাতার পরিচিতি :

১. নাম

২. পেশা

Dhaka University Institutional Repository

৩. ঠিকানা

৪. ফোন নম্বর

৫. প্রতিষ্ঠানের নাম

৬. প্রতিষ্ঠানের পদমর্যাদা

প্রশ্ন : ১. আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গঠন কাঠামো কতটুকু গণতান্ত্রিক বলে আপনি মনে করেন ?
উত্তর :

প্রশ্ন : ২. বিশ্বায়ন ও জাতিরাষ্ট্রের সম্পর্ক কীরূপ ?
উত্তর : মতামত দিন .....

প্রশ্ন : ৩. পিআরএসপি তে বলা হয়েছে 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের প্রচেষ্টাই হচ্ছে সুশাসন নিশ্চিত করা'। আপনি কি এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত ?
উত্তর :

প্রশ্ন : ৪. বাংলাদেশের শাসনসংক্রান্ত ইস্যুতে বিশ্বব্যাংকের প্রভাব কীরূপ ?
মতামত দিন ... ...

প্রশ্ন : ৫. সুশাসন সম্পর্কে আপনার মতামত কী ?
মতামত দিন ... ...

বিশ্বায়ন এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ঃ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাসন সংক্রান্ত শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

শিক্ষক ও আমলা

গ্রুপ : 'খ'

সাক্ষাতকারদাতার পরিচিতি

১. নাম :

Dhaka University Institutional Repository

২. পেশা :

৩. ঠিকানা :

৪. ফোন নম্বর :

৫. প্রতিষ্ঠানের নাম :

৬. প্রতিষ্ঠানের পদমর্যাদা :

প্রশ্ন : ১. প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে বর্তমানে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে ?

প্রশ্ন : ২. পিইডিপি-১ ও পিইডিপি-২ সম্পর্কে আপনার মতামত .....

প্রশ্ন : ৩. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সম্পর্কে আপনার মতামত কী ?
উত্তর :

প্রশ্ন : ৪. একটি অভিযোগ – দাতাগোষ্ঠীর সাহায্যের বিনিময়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে কিছু শর্ত মেনে নিতে হয় এ সম্পর্কে আপনার মতামত .....
উত্তর :

প্রশ্ন : ৫. দেশীয় প্রতিষ্ঠানের আমলাতান্ত্রিক দুর্বলতা পিইডিপি-১ ও পিইডিপি-২ প্রকল্পকে বিলম্বিত করেছিল, আপনি কি এর সঙ্গে একমত ?
উত্তর :

প্রশ্ন : ৬. প্রাথমিক শিক্ষার মানের উন্নয়নে আপনার সুপারিশসমূহ কী কী ?
উত্তর :

পরিশিষ্ট-২

বিশ্বায়ন এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ঃ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাসন সংক্রান্ত শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

বিষয় বিশেষজ্ঞ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রুপ : 'ক'

সাক্ষাতকারদাতার পরিচিতি :

ক্রমিক নম্বর	**সাক্ষাতকারদাতার নাম, পদবী ও ঠিকানা**	**সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ**
১।	মনজুর আহমদ, পরিচালক শিক্ষা উন্নয়ন ইনিস্টিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।	২রা জানুয়ারি, ২০১৪
২।	সিদ্দিকুর রহমান, শিক্ষাবিদ।	৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪
৩।	ডালেম চন্দ্র বর্মন, অধ্যাপক, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	১৭ই মে ২০১৪
৪।	মাহবুবুল মোকাদ্দেম আকাশ, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	১৯শে জুন ২০১৪
৫।	পলাশ হোসেন, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, কুমিল্লা।	২৩শে জুন ২০১৪
৬।	আরিফুজ্জামান তুহিন, গবেষক ।	২৫ই জুন ২০১৪
৭।	জ্যোতির্ময় বর্মন, যুগ্মসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	৯ই জুলাই ২০১৪
৮।	রমেন রায়, গবেষণা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা অফিস, খুলনা।	২৪ই জুলাই ২০১৪
৯।	স্মৃতি রায়, শিক্ষক, ফেনী সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ।	১১ই জুলাই ২০১৪
১০।	ফেরদৌস হোসেন, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	১৮ই মার্চ ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক ও আমলা

গ্রুপ : 'খ'

সাক্ষাতকারদাতার পরিচিতি :

ক্রমিক নম্বর	সাক্ষাতকারদাতার নাম, পদবী ও ঠিকানা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ
১।	মো.মুরশিদআক্তার, গবেষক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	২০শে মার্চ ২০১৪
২।	বাসন্তি ঢালি, শিক্ষক, সুরভী বিদ্যালয়, ঢাকা।	১লা এপ্রিল ২০১৪
৩।	তাপসী নিলীমা, ফেলো, Teach for America, ঢাকা।	২রা এপ্রিল ২০১৪
৪।	জগন্নাথ অধিকারি, প্রধান শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।	১৪ই এপ্রিল ২০১৪
৫।	লতা মজুমদার, শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।	১৯শে এপ্রিল ২০১৪
৬।	মাহাবুব নেহার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর ।	৫ই মে ২০১৪
৭।	মোঃ গিয়াস উদ্দিন, গবেষক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা ।	১১ই মে ২০১৪
৮।	মাহাফুজ আলী, গবেষক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা ।	১০ই জুন ২০১৪
৯।	আজিজুল হক, গবেষক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা ।	১০ই জুন ২০১৪
১০।	উর্মি আহমেদ, শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।	৭ই জুলাই ২০১৪
১১।	ঝর্না আক্তার, শিক্ষক, ব্রাক বিদ্যালয়।	১৪ই জুলাই ২০১৪
১২।	কনিকা দাস, শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।	১৫ই জুলাই ২০১৪
১৩।	জয়নব বেগম, কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	৬ই আগষ্ট ২০১৪
১৪।	মহসিন হক, কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	৬ই আগষ্ট ২০১৪
১৫।	হোসাইন মোহাম্মদ এমরান, ইনস্ট্রাক্টর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	৯ই আগষ্ট ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository